তঞ্চঙ্গ্যা রূপকথা লোককাহিনী ও কিংবদন্তী

বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

তঞ্চঙ্গ্যা রূপকথা লোককাহিনী ও কিংবদন্তী

বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
রাঙ্গামাটি।

CamScanner

তঞ্চঙ্গ্যা রূপকথা লোককাহিনী ও কিংবদন্তী

প্রকাশনায়
গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
রাঙ্গামাটি।

প্রথম প্রকাশ
২০০৫ খ্রিঃ

প্রচ্ছদ ও ছবি অলংকরণে
দয়াল মোহন চাকমা

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণে
সীবলী অফসেট প্রেস
কাকলী মার্কেট, কাঠালতলী
রাঙ্গামাটি।

মূল্য ঃ ১০০.০০ (একশত) টাকা মাত্র।

Tanchangya Rupkotha Lokokahini O Kingbodonti
(Fairytales, Folktales and Legends of the Tanchangya)
Published by Research & Publication wing, Tribal Cultural Institute, Rangamati.

Price: Taka 100.00 Only.

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতির বসবাস রয়েছে। এদের মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি অন্যতম। তঞ্চঙ্গ্যাদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা ও নানা লোক সাহিত্যের উপকরণ। তাদের রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদন্তীগুলিও বেশ চিত্তাকর্ষক যেগুলির যথেষ্ট সাহিত্যিক মূল্য রয়েছে। এগুলি এতদিন যাবত প্রকাশের অভাবে লোক চক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে। তাই এগুলি প্রকাশিত হওয়া দরকার। তা না হলে হয়তো এগুলি হারিয়ে যেতে পারে। তাই এ জাতীয় উপজাতীয় লোক সাহিত্য সংগ্রহের ব্যাপারে রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সৌভাগ্যের বিষয় যে, জনাব বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা অনেক দিন ধরে তঞ্চঙ্গ্যাদের রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদন্তী সংগ্রহের কাজ করেছেন এবং এ বিষয়ে একটি পান্ডুলিপি প্রস্তুত করে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট-এ প্রকাশের জন্য জমা দিয়েছেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

আমরা এ বইটি প্রকাশের সদয় অনুমতি দানের জন্য সর্ব প্রথমে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান ডঃ মানিক লাল দেওয়ান-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া বইটি প্রকাশ ও উন্নয়নের ব্যাপারে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এর গবেষণা ও প্রকাশনা শাখার সহকারী পরিচালক জনাব রুনেল চাকমা ও রিসার্চ অফিসার জনাব শুভ্র জ্যোতি চাকমা যথেষ্ট শ্রম দিয়েছেন। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

আমরা আশাকরি বইটি পাঠক সমাজে গৃহিত হবে এবং তাই যদি হয়, তবে আমাদের উদ্দেশ্য ও উদ্যোগ সফল হবে।

সুগত চাকমা
পরিচালক (ভাঃ)
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
রাঙ্গামাটি।

ভূমিকা

তঞ্চঙ্গ্যাদের লোকমুখে প্রচলিত লোকায়ত বহু চিত্তাকর্ষক কল্প-কথা ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। এগুলি আপাত দৃষ্টিতে প্রায় একই রকম মনে হলেও আসলে রূপকথা, লোককাহিনী ও কিংবদন্তী ভেদে আলাদা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। দীর্ঘকাল লোকমুখে প্রচলিত চিরায়ত রূপলাভ করলেও অদ্যাবধি এগুলি সংগৃহিত হয়নি এবং গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়নি বলে অনেকের কাছে এসব অজানাই থেকে গেছে। এসব কল্প-কথায় সাহিত্যের বিভিন্ন রস এবং তঞ্চঙ্গ্যাদের লোকায়িত মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রচলিত বেশ কয়েকটি রূপকথার সঙ্গে চাকমাদের রূপকথার মিল রয়েছে।

আমি রাঙ্গামাটির আশপাশে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যাদের কাছে এরকম প্রচলিত কাহিনীর সন্ধান পেয়ে কয়েকটি সাগ্রহে সংগ্রহ করেছি। আমার সংগৃহিত কাহিনীগুলো মিলিয়ে একটি পান্ডুলিপি প্রস্তুত করি এবং প্রকাশের উদ্দেশ্যে রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের বর্তমান পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব সুগত চাকমার সাথে এ বিষয়ে আলাপ করলে পান্ডুলিপিটি ইনস্টিটিউটে জমা দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে সহৃদয় অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। পান্ডুলিপি জমা দেওয়ার স্বল্পদিন পরে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ এর মাননীয় চেয়ারম্যান ডঃ মানিক লাল দেওয়ান পান্ডুলিপিটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য সদয় অনুমোদন প্রদান করেন। আমি উভয়ের নিকট আন্তরিকভাবে চিরকৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ রইলাম। "তঞ্চঙ্গ্যা রূপকথা, লোককাহিনী ও কিংবদন্তী" নামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। রাঙ্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের রিসার্চ অফিসার জনাব শুভ্র জ্যোতি চাকমা গ্রন্থটির শোভন ও সুষ্ঠু প্রকাশের জন্য অক্লান্ত আয়াস স্বীকার করেছেন। তাঁকে এবং উ.সা.ই এর সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

গ্রন্থটি সহৃদয় পাঠকদের মনে যৎসামান্য আনন্দের সঞ্চার করলে আমি আমার শ্রম স্বার্থক বলে মনে করব।

বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রাঙ্গামাটি।

সূ চি প ত্র

❑ রূপকথা ঃ পৃষ্ঠা

❑ কলাথুর কন্যা- ৭
❑ বাঘ ও শূকরের মিতালী- ১৩
❑ তেন্দেরার পচ্ছন- ২৬
❑ দুলুক্কুণ্ডী- ৩৭

❑ লোক কাহিনী ঃ

❑ বন মানুষের সঙ্গে বসবাস- ৪৪
❑ লাংগেই ডর- ৫১

❑ কিংবদন্তী ঃ

❑ ধন্ধ কামাহ- ৫৫
❑ বগা কাইন- ৬২

❑ কয়েকটি ভূতে পাওয়ার কাহিনী ঃ ৭২

CamScanner

কলাথুর কন্যা

(কলাবতী কন্যা)

সেই কবে থেকে আরাকান 'রোয়াং দেশ' নামে পরিচিত ছিল। চাকমাদের একটি শাখাকে রোয়াইঙ্গ্যারা (আরাকানীরা) দৈংনাক নামে অভিহিত করে। মারমারাও তাদের ন্যায় দৈংনাকই বলে। এখনো সে দেশে দৈংনাক বলা হয় এবং সে দেশে এখনো দৈংনাক আছে।

একবার একদল দৈংনাক স্বজাতি চাকমাদের অনুসরণ করে 'আনক'- (চট্টগ্রামে) চলে আসে। অন্যান্যদের ন্যায় চক্রধন আঙুও আত্মীয় স্বজন এবং তার অনুগত লোকজন নিয়ে আরাকান থেকে এতদঞ্চলে প্রবেশ করে প্রথমে আলীকদমের তৈনছড়ির অববাহিকা এলাকায় বসতি স্থাপন করে। (রোয়াং দেশ থেকে 'আনক' বা চট্টগ্রাম অঞ্চলে আসার পর, তৈনছড়িতে বসতি স্থাপন এবং কিছুকাল সেখানে অবস্থান করায়, তারা তৈনছর্য্যা বলে পরিচিত লাভ করে।)

তারা সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে মাতামুহুরী নদীর অববাহিকা এবং শংখ নদী পার হয়ে 'বড়গাং' বা কর্ণফুলী নদীর পাড়ে এসে পড়ে। কর্ণফুলীর উজানে অগ্রসর হয়ে, চন্দ্রঘোনার কয়েক মাইল উজানে রাম পাহাড় ও সীতা পাহাড়ে এসে থামে। তখন সেখানে জুমের উপযোগী প্রচুর বনভূমি ছিল। অনেকে সেখানে বসতি গড়ে তোলে। আবার কেউ কেউ কর্ণফুলীর ওপাড়ে ওয়াগ্গা, পূর্বে কাপ্তাই আর রাইংখং নদীর অববাহিকায় ছড়িয়ে পড়ে। এইসব জায়গাতে তারা বসবাস করতে থাকে। তারা তৈনছড়ি থেকে এসেছে বলে চাকমা রাজার ভূমি অফিসে জুম-তৌজিতে তাদেরকে তৈনছর্য্যা চাকমা নামে তৌজিভুক্ত করা হয়। এই তৈনছর্য্যা শব্দটিই কালক্রমে তৈনচংগ্যায় রূপ লাভ করে বলে কারোর কারোর ধারণা। বর্তমানে তা 'তঞ্চঙ্গ্যা' লিখা হয়ে থাকে।

আমরা এবার 'কলাথুর কন্যা' রূপকথাতে ফিরে যাই। এই কাহিনীটি হলো সেই সময়ের যে সময় তঞ্চঙ্গ্যারা রাম পাহাড়, সীতা পাহাড়ে জুম করত। চক্রধন আঙুর আত্মীয় স্বজন সীতা মোইন বা সীতা পাহাড়েই বসতি স্থাপন করে। তার মেঝো মেয়ে সনামালা বিধবা। সে দ্বিতীয় বার বিয়ে করেনি। রোয়াঙে কলাডেন নদীর পাড়ে কুমুখ্যাং পাড়ায়

CamScanner

তাদের ঘর ছিল। তার বাবা চক্রধন আঙু ও তার দল যখন এতদৃঞ্চলে আসে, বিধবা সনামালা তার একমাত্র সন্তান পাঁচ বছর বয়সী রাঙাধনকে নিয়ে এখানে আসে। সে তার বাপের পরিবারে থাকে না, রাঙাধনকে নিয়ে পৃথক ঘরে থাকে। তার ভাইয়েরা তার জুমের জন্য গভীর বন-জঙ্গল কেটে দেয়, শুকনো জঙ্গল আগুনে পুড়িয়ে দেয়। সনামালা আধমরা গাছের ডাল-পালা সাফ করে জুমের ক্ষেত তৈরি করে। তার ভাইয়েরাও এতে সাহায্য করে। ক্ষেত তৈরি হলে ধান, তিল, কার্পাস এবং নানান ফসলের বীজ বুনে। ক্ষেতের আগাছা বাছে, ধান পাকলে ধান কেটে ঘরে তোলে। রাঙাধন এখন চৌদ্দ/পনের বছরের তরুণ। সে তার মামাদের সঙ্গে জুমের জঙ্গল কাটা এবং তার মাকে জুমের কাজে একটু আধুট সাহায্য করে। বেশির ভাগ সময় তার খেয়াল খুশি মত এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে সময় কাটায়।

তখন রাম মোইন-সীতা মোইনে বিশাল বিশাল বৃক্ষাদির ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর 'তেল্যাকলার' (একপ্রকার জংলী কদলী) থোর (মোচা) হতো। এসব দেখতে বেগুনী রঙের, তেলতেলে ও মসৃণ হয়ে থাকে।

সেই সময় রাঙাধনের বয়স চৌদ্দ/পনের বছর। তার তরুণ মনের আকাশে সবে মাত্র রঙধনুর রঙ্গিন আল্পনার আবির্ভাব হচ্ছে। সে তার মামাদের সাথে জুমের জঙ্গল কাটতে যায় এবং অন্যান্য কাজেও যায়। কিন্তু মন দিয়ে কাজ করেনা, করতে চায় না। খেয়াল খুশি মত চলে। কাজ করতে করতে প্রায় সময় সে 'ছড়া' বা ঝিরির পাড়ে গিয়ে তেল্যাকলার বনে গিয়ে তেল্যাকলার থোরগুলি চেয়ে দেখে, আর কলা গাছের আগায় পাতায় যে রৌদ্রের ঝলক পড়ে, সেইসব চেয়ে চেয়ে দেখে। কচি কলাপাতা মৃদু সমীরণে দোলে, সূর্যের আলো তাতে আছড়ে পড়ে, ঝিলিক তুলে। রাঙাধন সেই ঝিলিকে মোহিত হয়, আনমনে হেসে ওঠে। মনে মনে বলে, তেল্যাকলার থোর এত সুন্দর কী করে হয়! তার মাসতুতো বোন ধংমালা তার চেয়ে দু'বছরের বড়। রাঙাধন তাকে মনে মনে তুলনা করে তেল্যা কলার থোরের সঙ্গে। পিছল বেগুনী রঙের তেলতেলে কলার থোরের যে মায়াময় লাবণ্য, তা ধংমালার মাঝে সে দেখতে পায়। মনে মনে ধংমালাকে তার বৌ কল্পনা করে আনে সে ঘরে। তার মাকে মাঝে মাঝে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে- মা, ধংমালা কবে

CamScanner

আমাদের ঘরে আসবে? তার মা সনামালা বুঝতে পারে রাঙাধনের মনের বনে যৌবনের ভ্রমর পাখা মেলতে শুরু করেছে। কিন্তু কিছু বলে না, কারণ, ধংমালার সঙ্গে চক্রধন আঙুর আর এক নাতির 'আইফাই' (ভালবাসা) চলছে।

এক বছর তরুণ যুবক রাঙাধন তার মামাদের সঙ্গে জঙ্গল কাটতে গেছে। সেদিন সে একটা ঝোপ কাটার পর তার মামাদের থেকে সরে গিয়ে জুমের প্রান্তে ঝিরির পাড়ে চলে এল। এখানে ঘন তেল্যা-কলার বন। তখন ফাল্গুন মাস। মনোরম তেল্যাকলার থোরগুলো বাতাসে দোলছে আর সোনালী রোদের ঝিলিক কচি কোমল মোলায়েম মসৃণ কলা পাতায় পড়ে ঝিকমিক করছে। রাঙাধনের চোখ সে দিকে গিয়ে আটকে গেল। থোরের অপরূপ লাবণ্য এবং কচি পাতায় রোদ্রের ঝলকে রাঙাধন পুলকিত হয়ে খিল খিল করে হাসতে লাগল। তখন তার চোখে ধংমালার রূপ লাবণ্য স্পষ্ট প্রতিভাত হতে লাগল। লোভনীয় এই থোর আহরণের জন্য গাছ কাটতে শুরু করে দিল রাঙাধন। চারটা কলা গাছ কাটার পর পঞ্চম কলা গাছে কোপ দিতেই রাঙাধনের কানে এল কোমল নারী কণ্ঠের আবেদন,-রাঙাধন, তুমি কলা গাছ কেটে শেষ করলে, আমার থাকবার স্থান নষ্ট করে দিয়েছ। রাঙাধন বিস্ময়াপন্ন হয়ে চকিতে চারদিকে তাকায়, কাউকেও না দেখে প্রশ্ন করল, -তুমি কোন অচেনা নারী আমার নাম ধরে কথা বললে?" এবার কলা গাছের আগা থেকে রাঙাধন স্পষ্ট শুনতে পেল,-"আমি কলাখুর কন্যা"। রাঙাধন সেদিকে তাকিয়ে বিস্ময় বিস্ফোরিত দু'নয়নে দেখতে পেল- থোরের রঙে এক পরমা সুন্দরী ললনা। তার পোশাক পরিচ্ছদ 'পিনন' আর 'খাদি' কচি কলা পাতার রঙে সাজানো; মোলায়েম, কোমল এবং মসৃণ। রাঙাধন তাকে দেখে যেমন বিস্মিত হল, তেমনি যারপর নাই হল খুশি। এক মূহুর্ত ভেবে মৃদু হেসে বলল,-আমি তোমাকে চিনি না অথচ তুমি আমাকে চেন, আমার নাম ধরে ডাকলে। তুমি কে বলতো? কলাখুর কন্যা উত্তর দিল-"আমি কলাখুর কন্যা। আমি তোমাকে চিনি। কালাডেন গাঙের পাড়ে আমার ঘর। তোমরা এখানে আসার সময় আমার ঘরের সম্মুখ দিয়ে এসেছিলে। আমার এখনো মনে আছে। তুমি আমার থাকার জায়গা নষ্ট করে দিয়েছ। তাই এখন আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও"।

রাঙাধন অতীব আশ্চর্যান্বিত হলেও কলাখুর কন্যার এই অনুরোধে

দারুণ খুশি হল। কেননা, কলাথুর কন্যাকে দেখে সে মোহিত হয়ে গেছে। সিঁড়ি বানিয়ে সে উপরে উঠে কলাথুর কন্যাকে এক হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে নীচে নামিয়ে আনল। তারপর তার এক হাত ধরে তাকে এনে ঘরের উঠানে নিয়ে এসে তার মাকে ডেকে বলল, "মা, মা, দেখ, আমি কলাথুর কন্যাকে বৌ করে এনেছি"।

তখন রাঙাধনের বড় মামা বিযুরাম আর কনিষ্ঠ মামা খুলারাম কাজ করতে করতে দুপুরে ভাত খাওয়ার জন্য ঘরে ওঠে ঘরের 'চানায়' (বারান্দায়) বসে আছে। রাঙাধনের মা সনামালা ভাত বেড়ে দিচ্ছে। তারা এক পলক দেখল কলাথুর কন্যাকে। দেখে চমকিত হল। কলাথুর কন্যা তাদেরকে দেখে ঘরে উঠল না। দৌড়ে কিয়দ্দুর গিয়ে বনে আত্মগোপন করল। রাঙাধনের কনিষ্ঠ মামা খুলারাম এখন পূর্ণ যৌবনের অধিকারী। এখনো সে বিয়ে করেনি। রাঙাধনের চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড়। তার বয়োকনিষ্ঠ ভাগিনা রাঙাধন কলাথুর কন্যাকে বৌ নিয়ে এসেছে জেনে তার মনে খুব দুঃখ হলো। সে মনের দুঃখে অভিমান করে ভাত খেল না। তার দিদি সনামালা তাকে অনেক বোঝাল। খুলারাম জেদ করে থাকে; না সে ভাত খাবে না। সনামালা বার বার তাকে ভাত খেতে অনুরোধ করল। তবুও ভাত না খেয়ে খুলরাম অভিমান করে বসে রইল।

এদিকে কলাথুর কন্যা সেই যে কলার বনে ঢুকেছে সেই কলার বন থেকে আর বের হচ্ছে না। ভাত খাবার পর খুলারামের বড় ভাই বিযুরাম আবার কাজ করতে জুমে গেল। খুলারাম অনাহারে ঘরে শুয়ে রইল, কাজ করতে গেল না। তার দিদি সনামালা তাকে বুঝিয়ে বলল, 'তোমার ভাগিনা বৌকে দেখে তুমি রাগে অভিমানে ভাত খেলে না, লোকে তোমাকে দেখে হাসবে, তোমাকে পাগল বলবে। এসো ভাত খাও। খুলারাম উত্তর দিল-দিদি, আমি পাগল নই। যারা যুবক, অবিবাহিত তারাই আমার দুঃখ বুঝবে। তুমি আমার দুঃখ বুঝবে না। আমি ভাত খেতে পারি, যদি আমার ভাগিনা বৌ কলাথুর কন্যা আমাকে ভাত বেড়ে দেয়। সনামালা বলল, আচ্ছা।

এদিকে রাঙাধন সারাক্ষণ ঘরের আশেপাশে, বনে কলাথুর কন্যার সন্ধান করল। কিন্তু ব্যর্থ হল। কোনখানে কলাথুর কন্যার সন্ধান

পেল না। খুলারাম ভাবছে, আহা সে যদি রাঙাধন হত!

দিন শেষ হয়ে গেল। সূর্য অস্তমিত হলে সাঁঝের আঁধার নেমে এল। ফাল্গুনের নির্মল সুনীল আকাশে একটা করে অসংখ্য তারকা মিট মিট করে জ্বলে উঠল। তখন সে আলোয় ঘরের অদূরে বনে কলা গাছের উপরিভাগে কলাখুর কন্যাকে দেখা গেল। সনামালা, খুলারাম, রাঙাধন কলাখুর কন্যাকে দেখতে লাগল। রাঙাধন চট জলদি দৌড়ে গেল কলা গাছের গোড়ায়। কলা গাছের সিঁড়ি বানাতে বানাতে কলাখুর কন্যা তাকে বলল, রাঙাধন, তুমি বদ্ধ ছেলে মানুষ, কলা গাছ কাটছ কেবল। এখন ঘরে যাও আমি আপনা আপনিই আসব"। এদিকে খুলারাম তার দু'কানে যেন শুনতে পেল কলাখুর কন্যা তাকে বলছে,-"খুলারাম, তুমি কেন মনে দুঃখ পেলে। মনের দুঃখে অভিমান করে ভাত খেলে না কেন? তুমি আমাকে কলা গাছের উপর থেকে পেড়ে নিয়ে যাও-আমি তোমাকে ভাত বেড়ে দেব"। বলা বাহুল্য এই কথা শুধু খুলারামই নিজের কানে শুনল। অন্য কেউ শুনতে পেলনা। শুনে খুলারাম খুব খুশি হল। খুলারাম কাউকে কিছু না বলে বনের দিকে অগ্রসর হল।

সে সময় থেকে তঞ্চঙ্গ্যাদের অবিবাহিত পুরুষেরা ভাগিনার নব পরিণীতা বধূকে প্রথম যেদিন দেখে বা সাক্ষাৎ হয়, আকাশে তারকা দেখা না যাওয়া পর্যন্ত তাদের সে দিন ভাত খাওয়ার বিধান নেই। অবিবাহিত যুবকদের সঙ্গে বিবাহিত পুরুষেরাও ভাগিনার নববধূকে প্রথম যেদিন দেখে সেদিন আকাশে তারা দেখা না যাওয়া পর্যন্ত ভাত খাওয়ার নিয়ম নেই।

[পিনন-মহিলাদের নিম্নাঙ্গে পরনের কাপড়। খাদি- বক্ষবন্ধনী কাপড়। তেল্যাকলা-একপ্রকার কলা।কলাখুর- কলার মোচা।]

-০-

CamScanner

বাঘ ও শূকরের মিতালী

বনে নানা প্রজাতির পশু-পাখি বাস করে। কোন পশু মাংসভোজী, আর কোন কোন পশু তৃণভোজী। পাখিরা সাধারণতঃ শস্য, ফল, কীটপতঙ্গ, ছোট ছোট মাছ খেয়ে জীবন ধারণ করে। মাংসভোজী পশুরা খুব হিংস্র হয়ে থাকে। অপর দিকে তৃণভোজী পশুরা নিরীহ প্রকৃতির হয়ে থাকে। তৃণভোজী পশুদের মাংস খেয়েই মাংসভোজী পশুরা জীবনধারণ করে। তাই তৃণভোজী পশুদের উপর তারা বরাবরই চড়াও হয়। তারা আবার স্বজাতীয় পশুদের মাংসও বাদ দেয়না। একে অপরকে মেরে মনের সুখে মাংস ভক্ষণ করে উদর পূর্তি করে। তৃণভোজী পশুরা তাই সবসময় সন্ত্রস্ত হয়ে বিচরণ করে থাকে। কোথাও কোন হিংস্র পশু ওঁৎ পেতে আছে কি-না সে জন্য তাদের সবসময় সতর্ক অবস্থায় থাকতে হয়। তাই স্বাভাবতই তারা চঞ্চল। পাখিরা মাটিতে বিচরণ করলেও তাদের ডানা থাকাতে কোন হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে তারা সহজে আত্মরক্ষা করতে পারে। সে জন্য তারা অনেকটা নির্ভয়ে বাস করে। গাছের ডালে ডালে উড়ে বেড়ায়, কল কাকলী করে। তাদের কল কাকলী শুনে মনে হয় তারা কতই সুখী।

শত শত প্রজাতির পশু-পাখিদের অরণ্যে আইন শৃঙ্খলাও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সে আইন শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ আলাদা। অরণ্যের আইন নিতান্তই বন্য। যেখানে তৃণভূমি আছে কিংবা তৃণভোজী হরিণ, চঙরা (সম্বর) শূকর, খরগোশ প্রভৃতি বিচরণ করে, তার কাছাকাছিই চুপিসারে বিচরণ করে হিংস্র বাঘ, সিংহ। গন্ডার, হাতি, বুনোমহিষ প্রভৃতি বৃহৎ জন্তুরা ও সমগ্র বনাঞ্চলে বিচরণ করে থাকে। বাঘ-সিংহরা তাদের যেমন কিছু করতে পারেনা, তাদের ধারে কাছেও যায়না। এদের মধ্যে ধূর্ত বুদ্ধির অধিকারী পশু হল শিয়াল। হরিণ, শূকর প্রভৃতি তৃণভোজী পশু শিকার করা তার সাধ্যের বাইরে। শিয়ালও মাংসভোজী প্রাণী। সে বাঘ আর সিংহের পিছনে কিছু দূরত্ব বজায় রেখে খুব সতর্ক হয়ে বিচরণ করে। যখন কোন হরিণ, সম্বর, শূকর মারা যায়, তখন মৃত পশুর একাংশ বাগিয়ে নেবার তালে থাকে। অনেক সময় বেকায়দার ফলে হিংস্র

পশুর থাবার আঘাতে শিয়ালকে অহেতুক প্রাণ হারাতে হয়। এ হল বেচারা শিয়ালের অবস্থা। বেঁচে থাকার জন্য ধূর্ত বুদ্ধির আশ্রয় নেয়া ছাড়া তার কোন গত্যন্তর নেই। গভীর অরণ্য ছেড়ে শিয়াল লোকালয়ের কাছে থাকা অধিক পছন্দ করে। সে লোকালয়ে একটু চেষ্টা করলেই গৃহপালিত হাঁস, মুরগী শিকার করতে পারে। বন মোরগ কিংবা অন্য পাখি শিকার করা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন।

পাখিদের মধ্যে পেঁচার একটু বিশেষত্ব আছে। পেঁচার চোখের পাতা নেই। তার চোখে পলক পড়ে না। অপলক নেত্রে সে আলো সহ্য করতে পারে না। তাই দিনের বেলায় সূর্য্যর আলো থেকে বাঁচার জন্য পেঁচা ঝোপের মধ্যে অন্ধকারে বসে থাকে অথবা ঘুমায়। রাতের বেলাতেই সে চরে বেড়ায়, খাদ্য আহরণ করে। সারা রাত কুল-কুলায়। কিন্তু সকাল হলে ঘুমিয়ে পড়ে। এ জন্য একটি চাকমা প্রবাদ আছে, সারা রাত পেঁচায় কুলকুলায়, খুরোল্যা (কাঠ ঠোকরা) সনার তুক (সোনার মুকুট) পায়। তবে পেঁচাও ধূর্ত কম নয় বরঞ্চ কুটবুদ্ধিসম্পন্ন। সে যখন জেগে থাকে তখন চুপ করে থাকে। রাতে যখন গাছের ঝোপে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে তখন শব্দ করে। "পুকজুক পেদরললত পুক জুক পেদরললত, পুক জুক পেদরললত" তখন শিকারী নিশাচর বনবিড়াল মনে করে, পেঁচা বেটা তার আহরণ করা পোকা আরাম করে খাচ্ছে। তাই বনবিড়াল সে দিকে যায় না আর পেঁচাও নিরাপদে ঘুমায়।

সমগ্র বনাঞ্চলে সিংহই হল অঘোষিত সম্রাট। হাতী, গন্ডার, বুনোমহিষ প্রকান্ড শরীরের অধিকারী হলেও অন্য পশুদের শাসন করার ক্ষমতা তাদের নেই। প্রকান্ড শরীরগুলো টিকিয়ে রাখার জন্য অহরহ খাদ্য অন্বেষণ করতে হয় তাদের। অন্য কিছু করার বা ভাববার সময় তাদের নেই। সিংহ হিংস্র এবং শক্তিশালী। একটি হরিণ বা শূকর মারতে পারলে তার বেশ ক'দিন চলে যায়। নানা চিন্তা ভাবনা করার সময় তার আছে। তার মূর্তি ও শক্তিমত্তা দেখে অন্যান্য পশু-পাখিরা তাকে সমীহ করে এবং এ সুযোগে সে নিজেকে সমগ্র বনাঞ্চলের সম্রাট বলে জাহির করে।

বন্য পশু-পাখিদের একটি সার্বজনীন প্রাকৃতিক ভাষা আছে।

CamScanner

এটি সকলেই বুঝতে পারে এবং সে অনুযায়ী ধ্বনিও উচ্চারণ করতে পারে। এটি তাদের লিংগুয়াফ্রাংকা। এ লিংগুয়াফ্রাংকাই অরণ্য অঞ্চলের ভাষা। এ লিংগুয়াফ্রাংকা দিয়েই অরণ্য সম্রাট সিংহ তার শাসন পরিচালনা করে। মানব সমাজে যেমন অন্যায়-অবিচার, অঘটন ঘটে এবং সে সবের বিচার হয়ে অপরাধীর শাস্তি ধার্য করা হয়। পশু-পাখিদের মধ্যেও সে রকম অন্যায়, অবিচার, অঘটন সংঘটিত হয় এবং সে সবেরও বিচার করার উদ্যোগ পরিদৃষ্ট হয়। দুর্বলেরা সিংহের নিকট তাদের প্রতি কৃত অন্যায়-অবিচারের বিচার প্রার্থী হয়। সিংহ তার সভাসদদের পরামর্শে বিচার নিষ্পত্তি করে। সে রকম একটি ঘটনা এখনও অরণ্য অঞ্চলে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ঘটনাটি বা ঘটনার কাহিনী এখন মানব সমাজে রূপ কাহিনী হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

একদা কোন এক গভীর অরণ্যে এক শিকারির গুলির আঘাতে এক বাঘিনী তার শিশু শাবক রেখে মারা যায়। মাতৃহারা শাবকটি অসহায়ভাবে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করার সময় সদ্য প্রসূতি হওয়া এক শূকরীর নজরে পড়ে। শূকরীর একটিমাত্র শাবক। অসহায় ব্যাঘ্র শাবকটির প্রতি করুণা পরবশ হয়ে শূকরী ব্যাঘ্র শাবককে আপন শাবকের ন্যায় স্নেহের সাথে নিজের দুধ পান করিয়ে বাঁচিয়ে রাখে এবং লালন পালন করতে থাকে। ব্যাঘ্র শাবকটি দু এক মাস শূকরির দুধ পান করলেও তার জাতিগত স্বভাব অনুযায়ী ধীরে ধীরে এদিক ওদিক ঘোরা ফেরা করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী শিকার করতে আরম্ভ করে। ইতোমধ্যে শূকরছানা আর ব্যাঘ্র শাবকটির মধ্যে গভীর সখ্যতা গড়ে উঠেছে। এভাবে তারা বড় হতে থাকে এবং স্ব স্ব জাতিগত স্বভাব লাভ করে। এক সময় শূকরছানাটি তার মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যাঘ্র শাবকের সঙ্গে বন হতে বনান্তরে বিচরণ করে জীবন যাপন করতে লাগল। উভয়ের মধ্যে যে প্রগাঢ় হৃদ্যতা তা বলাই বাহুল্য।

ব্যাঘ্র মাংসভোজী হিংস্র পশু। বনাঞ্চলে সিংহের পরেই তার স্থান। ব্যাঘ্র শাবকটি সারাদিন বন্য পশু শিকার করে আর শূকর ছানাটি শস্য ক্ষেত এবং তৃণভূমিতে বিচরণ করে সন্ধ্যায় দুই বন্ধু একত্রিত হয়ে এক জায়গায় রাত কাটায়। এভাবে উভয়ে শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে

যৌবনে পদার্পণ করে পরিপূর্ণ বাঘ আর শূকরে পরিণত হল। বাঘটি শক্তিশালী হিংস্র শিকারি পশু এবং শূকরটি চর্বি জমে মোটাসোটা, নাদুস নুদুস হয়ে এক লোভনীয় জন্তুতে পরিণত হল। শূকর দুর্বল প্রাণী। অন্ততঃ বাঘের কাছেতো বটেই। প্রথম প্রথম সে বাঘটিকে সমশ্রেণী বা সমগোত্রীয় মনে করত। কিন্তু একদিন যখন দেখল বাঘটি তার সামনেই তাদের সমগোত্রীয় একটা শূকরের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে মেরে ফেলল এবং উল্লাস সহকারে মাংস ভক্ষণ করল, তখনই সে বুঝতে পারল বাঘ তাদের সমগোত্রীয় নয়। কিন্তু তখনো তার বোধোদয় হয়নি যে, সেও বাঘের ভক্ষ্য জন্তুতে পতিত হতে পারে।

একদিন বাঘ সারাদিন কোন শিকার জোটাতে না পেরে সন্ধ্যায় আস্তানায় ফিরে গম্ভীর হয়ে বসে রইল। শূকরটি এ অবস্থায় চিন্তিত হয়ে তার পাশে গিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করল। বাঘ আরো গম্ভীর হল এবং এক সময় হঠাৎ এক লাফ দিয়ে শূকরের গলায় কামড় বসিয়ে দিল। কিন্তু না, জোরে নয় অতি হাল্কা ভাবে বাঘ কেবল শূকরকে বধ করছে-এই ভাবে অভিনয় বা ভান করল মাত্র। শূকর ভয় পেল। দীর্ঘ দিনের সখ্যতার কারণে তবু সাহস করে বলল, একি বন্ধু! তুমি আমাকে এভাবে আক্রমণ করছ কেন? তুমি কি শেষ পর্যন্ত আমাকেও হত্যা করে খেয়ে ফেলবে? এ কথায় বাঘ শূকরকে ছেড়ে দিল এবং লজ্জার ভান করে বলল, ছিঃ ছিঃ বন্ধু, তুমি একি বলছ? আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে যে, তোমার মত অকৃত্রিম বন্ধুকে হত্যা করব? তোমার মত নাদুস নুদুস পশু ধরলেই আমার হাত থেকে পালিয়ে যায়, তাই একটু তালিম দিয়ে দেখলাম ভবিষ্যতে কিভাবে ধরতে হবে। নির্বোধ শূকর বাঘের এ কথায় আশ্বস্ত হল। বাঘটির কয়েকদিন ধরে শূকরের নাদুস নুদুস শরীর দেখতে দেখতে তাজা মাংসের লোভে মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। দীর্ঘদিনের সখ্যতার কারণে এতদিন লোভ দমন করে আসছে। কিন্তু শূকরের কণ্ঠনালীতে কামড় বসাতে গিয়ে বাঘটির লোভ বহুগুণ বৃদ্ধি পেল এবং তার পক্ষে লোভ দমন করা কঠিন হয়ে পড়ল।

একদিন সকালে শূকর যখন আহার অন্বেষণে আস্তানা থেকে রওনা দিচ্ছে, বাঘ এক গাছের আড়াল থেকে এক লাফ দিয়ে শূকরের

পিঠে কণ্ঠনালীর দিকে মুখ নিতে নিতে বলে, বন্ধু এতদিন তোমাকে রেহাই দিয়েছি, আজ কিন্তু তোমার তাজা মাংস খাব। শূকর ভীষণ ভয় পেল। সে বাঘের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণে উচ্চ লাফ দিল। আচমকা এ লাফে বাঘ নিজেকে ঠিক রাখতে পারলনা, শূকরের গায়ে আঁচড় কেটে মাটিতে পড়ে গেল। শূকরের গা থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। শূকর সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেছে। একটি গাছের গুঁড়িতে পিঠ রেখে বাঘের পুনরায় সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হল। বাঘ কিন্তু আক্রমণ করল না। শূকরের দিকে তাকিয়ে বলল, বন্ধু তুমি জাননা তুমি আমার ভক্ষ্য। তুমি কোন বিশ্বাসে এবং কোন সাহসে ভক্ষকের সঙ্গে মিতালী কর? আমি আর তোমাকে রেহাই দেব না। তোমার পিঠ থেকে আমাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বোধহয় বন্ধুত্ব ভুলে গিয়েছ। শূকর তার দেহে বাঘের নখের আঁচর লাগা স্থান থেকে রক্ত ঝড়তে দেখে এবার উপলব্ধি করল যে, বাঘ তার সমগোত্রীয় নয় এবং যে কোন মুহূর্তে বাঘ তাকে মেরে ফেলতে পারে। শিশুকাল থেকে সখ্যতা আছে বলে শূকর বাঘকে বন্ধুত্বের দোহাই দিতে থাকে এবং নম্রসুরে বলল, বন্ধু আমার মায়ের দুধ একসঙ্গে ভাগাভাগি করে খেয়ে বড় হয়েছি। আমার মা তোমাকে আপন সন্তানের মত আদরযত্ন করেছে- সে কথা কি ভুলে গেছ বন্ধু? বাঘ হুঙ্কার দিয়ে বলল, কি আজেবাজে কথা বলছ! বাঘের বাচ্চা কখনো শূকরের দুধ খায় নাকি? যাক এতদিন আমি তোমাকে রেহাই দিয়েছি, আর রেহাই দেবনা। আসল কথা কি জান? আমি গত রাতে স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি তোমাকে ঘাড় মটকিয়ে হত্যা করে তোমার তাজা রক্ত মাংস খাচ্ছি। স্বপ্নে আরো দেখলাম, বনের রাজা সিংহও অতি আনন্দের সঙ্গে তোমার তাজা রক্ত মাংস খেয়ে লাফাতে শুরু করেছে। অন্য কোন কথা বলে লাভ নেই, তুমি প্রস্তুত হও, আমি আমার দেখা স্বপ্ন অনুযায়ী তোমাকে এখনই মেরে ফেলব। শূকর বুঝতে পারল বাঘটির কথায় কোন কৃত্রিমতা নেই। রূঢ় অথচ সত্য কথাই বলছে বাঘ। শূকর অনুনয় বিনয় করে আমতা এবং ভয় জড়িত কণ্ঠে বলল, এ বনে অনেক পশু-পাখি আছে যারা এ বনেরই অপর প্রাণীর ভক্ষ্য। তথাপি বনের রাজা সিংহের শাসনাধীনে একই বনে যার যার প্রাণ রক্ষা করে বেঁচে আছে। আমাদের সকলের রাজা সিংহ মহাশয়ের সমীপে চল, তিনি যদি বলেন, তোমার

স্বপ্নের বিবরণ অনুযায়ী তুমি আমাকে ভক্ষণ করতে পারবে, তাহলে আমার কোন আপত্তি থাকবেনা। বন্ধুর জন্য আমার এ দেহ হাসিমুখে বিসর্জন দেব। বাঘ জানে যে, শূকর কোনদিন তার নাগালের বাইরে যেতে পারবেনা। সে যখন ইচ্ছা করে তখনই শূকরকে হত্যা করতে পারবে। এও জানে যে, মহাপরাক্রমশালী পশুরাজ সিংহ অবশ্যই তার পক্ষেই রায় দেবে, স্বপ্নের বিবরণ অনুযায়ী শূকরকে হত্যা করার নির্দেশ অবশ্যই দেবে। এ সব কথা ভেবে বাঘ বলল, ঠিক আছে বন্ধু, তোমাকে এ সুযোগ দিলাম। চল, পশুরাজ সিংহের দরবারে।

যথাসময়ে পশুরাজ সিংহের দরবারে হাজির হল তারা। পশুরাজ সিংহ শূকরকে দেখে অতি কষ্টে লোভ সংবরণ করল এবং শূকরের ঘাড় ভেঙ্গে তাজা রক্ত পান করার প্রবল ইচ্ছা কোন রকমে চাপা দিয়ে রাখল। শূকর বাঘকে দেখিয়ে তার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য পশুরাজ সিংহের কাছে প্রার্থনা জানাল। বাঘ কেন শূকরকে আক্রমণ করতে চায়, তা পশুরাজ জানতে চাইলে বাঘ দৃঢ় কণ্ঠে তার স্বপ্নের বিবরণ পশুরাজকে খুলে বলল। উভয়ের আর্জি শুনে সিংহ তার স্বভাবজাত কায়দায় গর্জন করে বলল, এ অরণ্য রাজ্যের ছোট,বড় প্রায় সকল পশু-পাখিই আমার দরবারে হাজির হয়েছ। শূকরের আবেদন এবং বাঘের স্বপ্নের বিবরণ সবাই শুনেছ। স্বপ্ন হল স্বর্গীয় ব্যাপার। এটি সৃষ্টি কর্তার নির্দেশ। বাঘ শূকরের মাংস খাচ্ছে বলে যে স্বপ্ন দেখেছে তা সৃষ্টিকর্তার নির্দেশেই হয়েছে। কাজেই বাঘ শূকরকে এখন খেতে পারবে। বন্য কুকুর এবং শিয়াল ভয়ে ভয়ে চাপা কণ্ঠে বলল, স্বপ্নে যাহা দেখে বাস্তবে তা হয় বা হওয়া প্রয়োজন এরকম কোন নজির নেই। অতএব বাঘ স্বপ্নে দেখেছে বলে শূকরকে কী করে ভক্ষণ করবে তা বুঝা যায়না। পশুরাজ সিংহ রাগান্বিত হয়ে বলল, শিয়াল, কুকুর তোমারও মাংস পেলে ছাড়না...... তোমাদের মুখে এ কথা সাজেনা, চুপ কর। সিংহের গর্জনে তারা গুটিশুটি মেরে বসে রইল। হাতী তার বড় বড় কান দুটি এবং লেজটি নেড়ে সিংহের গর্জন শুনে তার শুঁড়টি উর্ধে তুলে সোঁ সোঁ করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, বাঘের এ স্বপ্নটি অতি অদ্ভুত। এরকম অদ্ভুত স্বপ্ন স্বর্গীয় হবে কেন? আর সৃষ্টি কর্তার নির্দেশ হলে স্বপ্নের মধ্যে শূকর মরে যেত.......

CamScanner

সেতো এখনো বেঁচে আছে। কাজেই এ স্বপ্নটি মিথ্যা। এরকম অদ্ভুত স্বপ্ন কেউ কি দেখে? তার পাশে দাঁড়ানো পর্বতের মত বিশাল দেহধারী গন্ডার তার নাকের উপর অবস্থিত শিং সহ দুবার উপর নীচে সঞ্চালন করে গোঁ গোঁ শব্দে হাতিকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি জঙ্গলের সবার চেয়ে প্রকান্ড জন্তু, বনের অন্যদের সাথে তোমার তেমন সংশ্রব নেই। কে কীরকম স্বপ্ন দেখে তুমি জানবে কিভাবে? শুধু বাঘ নয় আর অন্য কেউ এর চেয়েও অদ্ভুত লোমহর্ষক স্বপ্ন দেখতে পারে। কারণ এটি স্বর্গীয় ব্যাপার। এবার সে পশু রাজকে উদ্দেশ্য করে বলল, "মহারাজ, বাঘ যা স্বপ্নে দেখেছে তা আমি বিশ্বাস করি। এবার আপনার রায় ঘোষণা করুন।" গন্ডারের কথায় সিংহ আহ্লাদিত হয়ে গুরুগম্ভীর স্বরে রায় ঘোষণা করল। বাঘ তার স্বপ্নের বিবরণ মত শূকরকে ভক্ষণ করবে আমি অনুমতি দিলাম। চারদিকে গুঞ্জন হল। বাঘ মুখ ব্যাদান করে হাসতে হাসতে শূকরকে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হচ্ছে এমন সময় হাতি বাঘের সামনে গিয়ে তার গতিরোধ করে সিংহকে লক্ষ্য করে বলল, মহারাজ বাঘকে ক্ষান্ত দিয়ে শূকরকে কিছুদিনের অবকাশ দিন। শূকর মৃত্যুভয়ে কাঁপতে থাকে। হাতির কথায় একটু সম্বিত ফিরে পেয়ে পশুরাজকে কাতর হয়ে নিবেদন করল; মহারাজ! আপনি ধর্মাবতার, আমাকে একমাস অবকাশ দিন, আমি আমার পক্ষে কথা বলার জন্য কারুকে হাজির করব। সিংহ তার নিবেদন শুনে হাতির কথা মনে করল। হাতি প্রথম থেকেই স্বপ্নের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে এসেছে। শূকরের আবেদন অনুযায়ী তাকে অবকাশ দিল। তবে মাত্র পনের দিন, একমাস নয়। বাঘ বিস্মিত হয়ে সিংহের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সিংহ আবার গর্জন করে শূকরকে বলল, পনের দিনের শেষ দিন তোমার উকিল হাজির করবে, না পারলে আর কোন ক্ষমা নেই। তারপর দিনই বাঘ তোমাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবে। অন্যান্য পশু-পাখিদের সে দিন যথা সময়ে হাজির থাকার আদেশ দিয়ে বিচার সভা ভেঙ্গে দিল পশুরাজ।

তৃণভোজী এবং সমগোত্রীয় পশু এবং পাখিদের কাছে অনেক অনুনয়-বিনয় করে তার পক্ষে ওকালতী করার জন্য শূকর কোন পশু কিংবা পাখি পেলনা। সে উকিলের সন্ধানে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াল।

কোন দিকে চলছে নিজেরও খেয়াল নেই, দিন-রাত শুধু চলছেই। দুচোখ ভরে তার পানি। কিছুই দেখতে পায়না। তবু হাঁটতে থাকে যদি ভাগ্যক্রমে কোন শুভাকাঙ্খী পায়। সাতদিন একটানা হাঁটার পর একরাতে ভোর হয় হয় এ অবস্থায় ক্লান্ত শূকরটি একটি মাঝারি গাছের কান্ডে টুঁ মারল। গাছটি লিকলিকে হলেও মাথায় ঘন ঝোপ। ঝোপসহ গাছটি কেঁপে উঠল। শূকর মাথায় মারাত্মক যন্ত্রণা পেয়ে থেমে গেল। গাছের ঝোপে ঝিমুচ্ছিল পেঁচা; সারারাত ডাকাডাকি করে বনভূমি মুখরিত করার পর ভোররাতে একটু ঘুমুতে চেষ্টা করছিল আরাম-আয়েশ করে। ঝাঁকুনি খেয়েই আচমকা কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে গেল তার। আপন মনে নিচে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল, কে গাছকে এমন নাড়া দিল? শূকরকে দেখতে পেল সে। কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে এমনিতেই রেগে গিয়েছে পেঁচা, আর শূকরের মত একটি জড় বুদ্ধি সম্পন্ন আবর্জনা প্রিয় জন্তু দেখে তার রাগ শতগুণ বেড়ে গেল। ঝোপ থেকে নীচে নেমে শূকরের মাথায় কয়েক লাথি মেরে আশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি আরম্ভ করে দিল। বেঁটা অন্ধ, বেকুব, গন্ড, মুর্খ সামনে কোথায় কি আছে দেখতে পাচ্ছিস্‌না। শূকর তার বিপদের কথা বলে বিলাপ করতে আরম্ভ করল। পেঁচার চোখের পাতা নেই বলে সূর্যালোতে সে বের হতে পারেনা, অগত্যা ঝোপের আড়ালে বসে কিংবা ঘুমিয়ে সূর্যালোকিত দিনের বেলাটা কাটিয়ে দেয়। সারারাত এবং আহারের সন্ধান করে। এজন্য অন্যান্য পাখিরা এদিক ওদিক উড়তে দেখে পেঁচা দিনের বেলায় ঝোপের মধ্যে থাকে বলে সে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে। শূকরের অবস্থা দেখে এবং তার বিলাপ শুনে বুঝতে পারল শূকর মহাবিপদে নিপাতিত হয়েছে। সিংহ ও বাঘ চক্রান্ত করে শূকরকে ভক্ষণ করার মতলব করেছে। পেঁচা তার অভিজ্ঞতা থেকেই এটা বুঝে নিল। একবার বনের মধ্যে পাখিদের মাঝে কী একটা প্রতিযোগিতা হয়েছিল। সংগীতের কিংবা সে ধরণের এক প্রতিযোগিতা। ঐ প্রতিযোগিতায় পেঁচাই বিজয়ী হয়ে পুরস্কার পেত, কিন্তু সারারাত ডাকাডাকি করে সবার চাইতে অধিক যোগ্যতা দেখালেও ভোররাতে ঘুমিয়ে পড়ে এবং যথাসময়ে বনের রাজা সিংহের সামনে হাজির হতে পারেনি। পেঁচার ডাকাডাকিতে কাঠঠোকরার ঘুম ভাঙ্গলে ভোর রাতে সিংহের দরবারে গিয়ে কিচির-মিচির কক্‌ কক্‌ কোকর ধ্বনি করে। ফলে

আর কাউকে না দেখে সিংহ কাঠঠোকরাকে সোনার মুকুট দিয়ে পুরস্কৃত করে। সে সময় থেকে কাঠঠোকরার মাথায় সোনার মুকুট শোভা পাচ্ছে। এ কারণে পেঁচা পশুরাজ সিংহের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ। সে সারারাত ডাকাডাকি করে বনভূমি মুখরিত রাখে আর কাঠঠোকরা ভোররাতে কয়েকবার কিচিরমিচির কক্ কক্ কোকর ধ্বনি করে সিংহের সামনে হাজির হতেই সিংহ তাকে সোনার মুকুট মাথায় পরিয়ে দিল। এ সম্পর্কে বনের অন্য পশু-পাখিরা নির্বুদ্ধিতার জন্য কটাক্ষ করে থাকে। এজন্য পেঁচার দুঃখের অন্ত নেই। বাঘের স্বপ্নদর্শন অনুসারে সিংহের প্রদত্ত নির্দেশ শুনে শূকরের প্রতি তার সহানুভূতি জাগল। তাকে সমবেদনা জানাল এবং সিংহকে উদ্দেশ্য করে তাচ্ছিলা ভাবে বলল, বাঘের স্বপ্নকে স্বর্গীয় ব্যাপার বলে তদনুযায়ী বাঘ শূকরকে ভক্ষণ করবে, সিংহের কী রকম বিচার এটা! আচ্ছা দেখা যাবে তারপর শূকরকে বলল, বাঘ স্বপ্নে দেখেছে বলে তোমার ঘাড় মটকাবে! বাহঃ কী সুন্দর যুক্তি সিংহের। আর বাঘের স্বপ্ন কত স্বর্গীয়। স্বপ্ন স্বর্গীয় বটে, আমিও কত স্বপ্ন দেখি, সে সবই স্বর্গীয়। একটু আগেও আমি রাজ সিংহাসনে বসে এ বনে রাজত্ব করতে স্বপ্ন দেখলাম। শূকরকে অভয় দিয়ে পেঁচা বলল, সে শূকরের পক্ষে ওকালতী করবে। সিংহের নির্ধারিত দিবসে সে দরবারে হাজির হয়ে যথাযথভাবে তার পক্ষে ওকালতী করবে। এ বলে পেঁচা সেখান থেকে উড়াল দিয়ে গভীর বনে ঢুকে গেল। পেঁচার কথাগুলো বাগাড়ম্বর মাত্র মনে করল শূকর। পেঁচা কি তাকে বাঘের হাত থেকে বাঁচাতে সক্ষম হবে? তার আশংকা দূর হলনা। জীবনের আশা একদম ছেড়েই দিল শূকর। তবে বিচারের নির্ধারিত দিনে রাজদরবারে হাজির হবে এবং তার পক্ষে ওকালতী করবে বলে পেঁচা যে বলে গেল, একথা সিংহকে জানালে ভাল হয় মনে করে শূকর সেদিনই সিংহকে তার উকিল পেঁচার কথা জানিয়ে আসল। ইতিমধ্যে বাঘের সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি। বাঘটির উদ্দেশ্য কত জঘন্য তা ভাবতে ভাবতেই শূকর বুঝতে পারল সবলের সঙ্গে দুর্বলের বন্ধুত্ব কত ভঙ্গুর।

পশুরাজ সিংহ যে দিনটি বিচারের জন্য নির্ধারণ করেছিল সে দিনই ঠিক বিচার সভা বসল। বনের পশু-পাখি একে একে হাজির হচ্ছে। হরিণ, খরগোশ, সজারু, বানর প্রভৃতি তৃণভোজী পশুর দল শূকরের

চারপাশ ঘিরে বসেছে। তারাও যেন শূকরকে সমবেদনা জানাচ্ছে। এছাড়া তাদের করার কিছুই নেই। শিয়াল, বন্য কুকুর, নেকড়ে বাঘের সামনে তফাতে দাঁড়িয়ে আছে। তারা ঘন ঘন বাঘ আর সিংহের মুখের দিকে তাকাতে থাকে। বুনো মহিষ, সম্বর, হরিণ, গয়াল, গন্ডার, হাতি সবাই পরস্পর সামান্য দুরত্ব বজায় রেখে এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। রাজ দরবারের পাশে ঘন ঝোপের বন ছিল।

পশুরাজ তার রাজকীয় আসনে এতক্ষণে এসে বসেছে। প্রচন্ড হুংকার ছেড়ে শূকরের আগমন জানতে চাইল। তখন শূকর ভীষণভাবে কাঁপতে কাঁপতে এক লাফ দিয়ে বেদনার্ত কণ্ঠে জবাব দিল, আমি হাজির, ধর্মাবতার। সিংহ জিজ্ঞেস করল, কোথায় তোর উকিল? দুবার, তিনবার জিজ্ঞেস করলেও শূকর কোন জবাব দিতে পারলনা। তার উকিল পেঁচার টিকিটাও দেখা যাচ্ছে না। সিংহ গর্জন করে উঠল এবং শূকরকে লক্ষ্য করে বলল, তুই ছেলে খেলা পেয়েছিস, তোর উকিল হাজির করবে বলে অনর্থক সময় নষ্ট করেছিস, আমাকেও অপমান করলি। তারপর বাঘকে সিংহ বলল বাঘ তুমি তৈরি হও। সভায় পশুদের গুঞ্জন উঠল। বাঘ শরীর একঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। শূকরের মৃত্যু সে যে কোন সময় ঘটাতে পারে। কেবল পশুরাজের হুকুমের জন্য অপেক্ষা। পশুরাজ তাকে তৈরী হতে নির্দেশ দিয়েছে। হত্যা কর বললেই সে এক মহুর্তও বিলম্ব করবেনা, প্রয়োজনও নেই। এক লাফেই সে শূকরের ঘাড় ভেঙ্গে দেবে। সিংহ এবার তার শেষ নির্দেশ দেবার জন্য গলা পরিস্কার করে নিল। ঠিক তখনিই সিংহের মাথার উপরে অবস্থিত ঝোপের আড়াল হতে বের হয়ে পেঁচা পশু সভার মধ্যে মহা উল্লাসে নাচতে লাগল। নাচছে তো নাচছেই, নাচতে নাচতে এক পর্যায়ে উড়ে বাঘের মাথায় লাথি মারে, আবার শূন্যে উঠে। আবার নীচে নেমে সিংহের সামনে উল্লাসে নাচতে থাকে। শূকর খেয়াল করল তারই উকিল পেঁচা। কিন্তু এরকম করছে কেন তার উকিল? রাজ সভায় ওকালতী করতে এসে একি বেয়াদবি। এতে আরও বিপদ বেড়ে গেল, নয় কি? রাজা ভীষণ রেগে যাচ্ছে। এখনি হুকুম করে সব শেষ করে দেবে। শিয়াল বাহাদূরি দেখাবার জন্য এক থাবা দিয়ে সিংহের সামনে নৃত্যরত পেঁচাকে ধরে

CS CamScanner

ফেলল। পেঁচা তখন আর্তনাদ করে উঠল; আ-হা-হা, করলে কি! করলে কি! রাজ সিংহাসনে বসতে না বসতেই তুমি আমাকে ধরে ফেললে! তুমি আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলে! তারপর পেঁচা সিংহকে উদ্দেশ্য করে বলল, মহারাজ আপনি ধর্মাবতার! আপনি বিচার করুন। আমার স্বর্গীয় স্বপ্ন শিয়াল ভেঙ্গে দিল। সিংহ উন্মত্ত হয়ে তর্জন করে উঠল। বেটা তোর আবার কি স্বপ্ন? যত সব আজগুবি ব্যাপার? তখন পেঁচা শিয়ালের হাত থেকে এক সুযোগে উড়ে গিয়ে গাছের ডালে উঠে বসল। তারপর বলল, বনের পশু-পাখি ভাই বোনেরা, আপনারা কেউ কি স্বপ্ন দেখেননা? কোন দিন কেউ স্বপ্ন নিশ্চয়ই দেখেছেন। শুধু এ বাঘই স্বপ্ন দেখে কি? স্বপ্ন দেখার কি তারই একচেটিয়া অধিকার? তখন গন্ডার তার মুখ উঁচু করে গোঁ গোঁ করে বলল, স্বপ্ন দেখার অধিকার আছে এবং সবাই স্বপ্ন দেখে, কেননা স্বপ্ন হচ্ছে স্বর্গীয় ব্যাপার। সিংহ একটু নরম হল। পেঁচাকে বলল, তোর স্বপ্নটা আবার কী? পেঁচা বলল, স্বপ্নটা বর্ণনা করতে আমার ভয় হচ্ছে মহারাজ। আপনি যদি অভয় দেন আমি বলব। সিংহের মুখে একটু বিদ্রুপ ভ্রুকুটি দেখা গেল। তাচ্ছিল্যভরে বলল, দেখি, বল দেখি, তোর কেমন স্বর্গীয় স্বপ্ন! যার দর্শনে তুই উন্মাদ হয়ে গিয়েছিস! এবার পেঁচা খুব বিনয় সহকারে দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল; মহারাজ ধর্মাবতার! আমি স্বপ্নে দেখলাম আপনি আপনার মেয়েকে মহা ধুমধামের সহিত আমার সাথে বিয়ে দিয়ে সুসজ্জিত রাজ সিংহাসন দান করছেন, আর বনের সকল পশু-পাখিকে আপনি বিরাট ভোজে আপ্যায়িত করছেন। তারা সবাই আপনার আস্তানায় বিপুল খাদ্য ভোজ্যে উদর পূর্তি করছে। আহা! কত আনন্দ! কী স্বর্গীয় আনন্দ মহারাজ!

সিংহের রাগ শতগুণ, সহস্রগুণ বেড়ে গেল। উন্মত্ত আক্রোশে আসন ছেড়ে উঠে হুংকার ছাড়ল; বেটা-কোন সাহসে তুই একথা উচ্চারণ করলি? তুই বেটা স্বপ্ন দেখলি কেন? আহাম্মক কোথাকার! তখন হাতি তার দুইকান ও লেজটি নেড়ে শুঁড় উর্ধে তুলে শোঁ শোঁ করে বলল, কী অদ্ভুত স্বপ্নরে বাবা! বড় অদ্ভুত স্বপ্ন! বাঘের স্বপ্নের কথা আমি বিশ্বাস করতাম না। এবার কিন্তু বিশ্বাস করলাম। পেঁচাকে আমাদের সবার সামনে রাজ সভায় উল্লাসে নৃত্য করতে দেখলাম। রাজার সামনে এরূপ

নৃত্য করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু পেঁচা যে স্বপ্ন দেখেছে এটি স্বর্গীয় ব্যাপারই বটে, তা সত্য, অতি সত্য। গন্ডার গোঁ গোঁ করে বলল, আমিও বলেছিলাম শুধু বাঘ নয়, আরো অনেকেই নানা রঙের স্বপ্ন দেখতে পারে এবং দেখেও থাকে। তৃণভোজী প্রাণীরা এবার উল্লাসিত হয়ে উঠল। তারা বলল, রাজকন্যার সঙ্গে পেঁচার বিয়ে হতে হবে- এখনই বিয়ে হোক। পেঁচাকে সিংহাসন প্রদান করে বনের পশু-পাখিগণকে বিয়ের খানা ভুরি ভোজ দেয়া হোক। আমরা উদর পূর্তি করে খাব। সিংহ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইল। বাঘ ম্লান মুখে সিংহের দিকে আর মাঝে মাঝে শূকরের দিকে তাকায়। পেঁচা এবার খুব নম্র এবং বিনয়ের সাথে সিংহকে বলল, মহারাজ ধর্মাবতার, আপনি বনের অধিবাসী পশু-পাখিদের রাজা, সর্বময় কর্তা বাঘের স্বপ্নের শর্তপূরণ করার জন্য বাঘকে যদি শূকরকে মারতে নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে আমি যে স্বপ্ন দেখেছি সে স্বপ্নের শর্ত অনুযায়ী রাজ কন্যা বিয়ে করতে এবং সিংহাসন লাভ করার জন্য আমাকেও নির্দেশ দেন।

পশুরাজ সিংহ নিজের ফাঁদে নিজে জড়িয়ে পড়ছে দেখে ঘাবড়িয়ে গেল। উপস্থিত বনের পশু-পাখিরা কলরব করে উঠল। বাঘ তখন ম্লানমুখে পশুরাজ সিংহের প্রতি চেয়ে থাকে। দীর্ঘক্ষণ ভাবার পর পশুরাজ সিংহ স্বপ্ন দর্শন অনুসারে শূকরকে ভক্ষণ করার বাঘকে যে অধিকার দিয়েছিল তা নাকচ করে দিল। অধিকন্তু, শূকরটির কোন বিপদ হলে তাতে বাঘকেই দায়ী করা হবে। এই ফরমান জারি করে পশুরাজ নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াস পেল।

-o-

CamScanner

তেন্দেরার পচ্ছন

(তেন্দেরার রূপকথা)

জালিম্বর একজন আঙু। 'আঙু' হল সমাজপতি বা দলপতি। পরবর্তীতে কোন তালুকের অধিকারীকে আঙু বলা হয়। জালিম্বর একদল লোক নিয়ে রোয়াঙ্গ (আরাকান) থেকে যখন আনকে (চট্টগ্রাম অঞ্চলকে রোয়াঙ্গারা আনক অর্থাৎ পশ্চিম দেশ বলে) আসে তখনো চট্টগ্রাম অঞ্চলে মোগলদের প্রভাব ছিল। তাই দলবল নিয়ে সে নাক্ষ্যংছড়ি ও রামু হয়ে উত্তর দিকে সরে ক্রমে ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তখন সংরক্ষিত বনাঞ্চল বলে কোন সরকারী বনাঞ্চল ছিলনা, বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল মুক্ত বনাঞ্চল। জালিম্বর আঙুর দলবল তার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলের এক সুবিধাজনক স্থানে গ্রাম পত্তন করে জালিম্বর আঙু তার দলবল নিয়ে বাস করতে থাকে। তার দলের লোকেরা জালিম্বরকে আঙু বলে মেনে নেয়। সে জালিম্বর-আঙু নামে পরিচিত হয়। বিয়ের সাত বছর পর তার একমাত্র পুত্রের জন্ম হয়। জালিম্বর এবং তার স্ত্রী বাদীমুই ছেলেটিকে কিভাবে আদর করবে তা নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া হত। তারা অতি আদরের ছেলেটির নাম রাখল চিজিগুলা। কিন্তু পাড়ার লোকেরা কেউ কেউ আদর করে কিংবা বিদ্রুপ করে ডাকে গুলা। চিজি বাদ দিয়ে শুধু গুলা। তারা অতি আদর যত্ন দিয়ে ছেলেটিকে বড় করতে লাগল।

কিশোর বয়সে চিজিগুলার জন্য বৌ আনতে সখ জাগল জালিম্বর আঙুর। পাড়ার সবচাইতে সুন্দরী ফুলরেণুকে চিজিগুলার জন্য বৌ ঠিক করা হল। ফুলরেণু বয়সে গুলার চেয়ে কয়েক বছরের বড় এবং পূর্ণ যুবতী না হলেও তার বিয়ের সাধ হয়েছে। ইতোমধ্যে যৌবনের রঙ্গীন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। বাগল্যার সঙ্গে তার আইপাই (মন দেয়া নেয়া) এবং ঘনিষ্টতার কথা কারোর অজানা ছিলনা। ফুলরেণু এ বিয়েতে কোনমতেই রাজি নয়। তার অভিযোগ হচ্ছে-গুলা তার চেয়ে বয়সে ছোট, এখনো কিশোর এবং গুলা ভাল করে কথা বলতে পারে না, তার জিহ্বায় আড়ষ্টতার দোষ আছে।

CamScanner

ফুলরেণুর বাবা মা আশুর একমাত্র সন্তান বিবেচনা করে গুলার সঙ্গে মেয়ে ফুলরেণুর বিয়ের কথা পাকা করে ফেলেছে। বিয়ে যেদিন হবে, তার আগের রাতে ফুলরেণু বাগল্যার সঙ্গে পালিয়ে যায়। সকাল হতে না হতেই ঐ খবরটি জালিশ্বর জানতে পারে। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে একজন বিশ্বাসী লোক পাঠিয়ে দিল ভিন্নগ্রামের তার মামাত ভাই নাগর্য্যার কাছে। লোকটি গিয়ে নাগর্য্যাকে বলল- "জালিশ্বর তার ছেলে চিজিগুলোকে বর সাজিয়ে নিয়ে আসছে, সে যেন তার মেয়ে মুগুলিকে কনে সাজিয়ে রাখে। চিজিগুলা আর মুগুলির আজই বিয়ে হবে। সব ব্যবস্থা যেন নাগর্য্যা করে রাখে।" নাগর্য্যা আর তার স্ত্রী খবরটি পেয়ে বিস্মিত হলেও বরঞ্চ খুশি হল। তার মেয়ে মুগুলির বয়স চিজিগুলার চেয়ে দু বছরের বড়। এমনিতে আত্মীয় আর জালিশ্বর হচ্ছে আশু বা দলপতি, কাজেই নাগর্য্যা আর তার স্ত্রী জালিশ্বরের কথায় বেরাজী হলনা। মুহুর্তের মধ্যেই লোকজন দিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলল নাগর্য্যা। মহা ধুমধাম সহকারে না হলেও সেদিন ঠিক ঠিক চিজিগুলা আর মুগুলির বিয়ে হয়ে গেল। পাড়া প্রতিবেশীরা এসে ভুরি ভোজন করে চিজিগুলা আর মুগুলিকে আশীর্বাদ করল।

জালিশ্বর আশু জুম চাষ করলেও তার কিছু ধান্যজমি আছে। গরু, ছাগল, মহিষ, শূকর, হাঁস-মুরগি গৃহপালিত পশু-পাখি তার অঢেল আছে। তার পারিবারিক অবস্থা সচ্ছল। একেবারে ধনী বলানা গেলেও দরিদ্র নয় জালিশ্বর আশু।

মুগুলির সঙ্গে বিয়ে হলেও চিজিগুলা ফুলরেণুকে ভুলতে পারেনি। তার কথা মাঝে মাঝে মুগুলিকে শোনায়। উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে এ ব্যাপারে কথা কাটাকাটি ও ঝগড়াঝাটি হয়। চিজিগুলা আর মুগুলির বিয়ের তিন বছর পর জালিশ্বরের স্ত্রী বাদীমুই মারা যায়। এর চার বছর পর জালিশ্বরও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। চিজিগুলা আর মুগুলি জোড়া তালি দিয়ে কোন রকমে সংসার চালিয়ে যাচ্ছে। পাড়ার লোকেরা তাদের নামের শেষাংশ উচ্চারণ করে ডাকে। যেমন- চিজিগুলাকে শুধু গুলা আর মুগুলিকে শুধু গুলি। উভয়ের কথা বলতেই

শুধু গুলাগুলি উচ্চারণ করে হাসে আর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে। গুলাগুলির সংসারে বিয়ের দীর্ঘ ছয় বৎসরেও কোন সন্তান সন্ততি হয়নি। জালিম্বর আজু স্বপ্নে দর্শন দিয়ে গুলাকে বলে-চিজিগুলা তোমরা বড় একা হয়ে গেছ, আমি আসছি। আমি তোমার ঘরে আসছি। কিছুদিনের মধ্যে গুলা বুঝতে পারল গুলি গর্ভধারণ করেছে। সে তার স্বপ্নের কথা গুলিকে বলে ফেলল। তাদের বিশ্বাসমতে গুলার পিতা জালিম্বর পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছে। এতে তারা খুশি হল। ঠিক দশ মাস দশদিন পর মুগুলি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাদের আনন্দ এখন দেখে কে?

সন্তানটি বড় হতে থাকে। যখন হাঁটতে পারে, কথা বলতে পারে, পাড়া মাতিয়ে রাখে ছেলেটি। তার বাবা-মাকে সে বাবা-মা ডাকেনা। বাবাকে ডাকে গুলা আর মাকে ডাকে গুলি। অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে আলাদা এবং ভিন্ন প্রকৃতির হয়েছে ছেলেটা। তার কথা-বার্তা, চাল-চলন, আচরণে চাতুর্য প্রকাশ পেতে থাকে। পাড়ার লোকেরা তাকে তেন্দেরা নামে ডাকতে লাগল। গুলা এবং গুলিও ছেলেটিকে তেন্দেরা নামেই ডাকতে থাকে। একদিন গুলা জঙ্গল থেকে একটি কচ্ছপ ধরে নিয়ে এল ঘরে। ডিমওয়ালা কচ্ছপ। কচ্ছপ কেটে রান্না করা হলে তেন্দেরা বলল যে, সে ডিমগুলোই খাবে-ডিম বাদে কিছুই খাবেনা। গুলা এবং গুলিও এতে খুশি। একটি মাত্র ছেলে, সে না খেলে খাবে কে? কিন্তু কচ্ছপের সেই হলদে রঙ্গের ডিমগুলো খাওয়া শেষ করে তার বাবা-মাকে বলতে লাগল, "ইস! তোমরা কী খাচ্ছ? আমাকে একটুও দিলে না। আমিও কচ্ছপের মাংস খাব।" কচ্ছপের মাংস পেট ভরে খেল ডিমগুলো খাওয়ার পর। খেয়ে বলতে লাগল, ইস্ এটা ডিমের চেয়ে সুস্বাদু। সে মুরগি বা মোরগের গিলা, কলিজা খায়না, শুধু খায় মাথা, ঠ্যাং ইত্যাদি। গুলাগুলি এই ডানপিটে ছেলে তেন্দেরার কান্ডে অবাক হয়ে থাকে।

বয়স বার, তের হতে না হতেই তেন্দেরার দেহে, মনে যৌবন এসে গেল। সে পাড়ার তরুণীদের পিছে পিছে ঘুরে বেড়ায়। পাড়ার ছেলেরা তাকে চোখে চোখে রাখে, সাবধান করে। গুলাগুলি ছেলের

এই আচরণ দেখে মর্মাহত হয় এবং তার জন্য বৌ আনার সিদ্ধান্ত নেয়। পাড়ায় অনেক তরুণী তাকে পছন্দ করলেও তেন্দেরা বিয়েতে রাজি হয়নি। তাই একদিন তারা তেন্দেরাকে ঘর থেকে নামিয়ে দেয়। তাকে বলে দেয় যে, সঙ্গে বৌ না নিয়ে আসলে ঘরে উঠতে পারবেনা।

তেন্দেরা কোন কথা না বলে বেড়িয়ে পড়ল শূন্য হাতে। পকেটে টাকা পয়সা নেই। কোন যুবতীর মন পেতে হলে নূন্যপক্ষে সুগন্ধি তৈল, আয়না চিরুনী দিতে হয়, একথা তেন্দেরার জানা আছে কিন্তু সে এগুলি পাবে কোথায়? টাকা পয়সা থাকলে বাজার থেকে সে কিনে নিতে পারত। কিভাবে টাকা- পাওয়া যায় এ কথা ভাবতে ভাবতে তেন্দেরা এক স্থানে গিয়ে দেখে একজন চাষী হাল চাষ করছে। এক জোড়া মহিষের হাল। সে মিষ্টি কথা বলে চাষীর সঙ্গে সখ্যতা করে বলল, দাদা তুমি বিশ্রাম কর, আমি তোমার বদলে হাল চালাই। লোকটি তাতে রাজি হল এবং তেন্দেরা হাল চষতে লাগল। বেশ খানিক্ষণ চষার পর তেন্দেরা লোকটাকে বলল, দাদা মশা-মাছি মহিষ দুটোর গায়ে বসে বড় উৎপাট করে। এতে মহিষগুলো বিরক্ত হয়, লাঙ্গল টানতে চায়না। বরঞ্চ মহিষ দুটোর গায়ে কাদা লেপে দিলে মশা-মাছি গায়ে বসে উৎপাট করবেনা। মহিষ দুটো আরাম করে হাঁটবে, লাঙ্গল টানবে। দাদা, আমি তাই করি, কী বল? লোকটি আপত্তি করলনা। তেন্দেরা মহিষ দুটোর গায়ে ভালভাবে কাদা লেপে দিল। সুর্যের তাপে কাদা শুকালে মহিষ দুটোর কালো রং সাদা হয়ে গেল এবং দুটো সম্পূর্ণ নতুন মহিষ বলে মনে হতে লাগল। তেন্দেরা একটু পর লোকটিকে বলল, দাদা আমার পানির তৃষ্ণা পেয়েছে, তোমার ঘরে গেলে কি পানি খেতে পারব? লোকটি বলল, সেকি কথা, পানি কেন পাবেনা? যাও ঐ যে টিলার ওপর ঘর, ওখানে গিয়ে আমার স্ত্রীকে বললে পানি দেবে। তেন্দেরা সন্দেহের ভান করে বলল, দাদা যদি পানি না দেয়, তখন আমি তোমাকে বলব, দিচ্ছে না- তাহলে তুমি তাকে দাও, দাও বলবে তো? লোকটি স্বাচ্ছন্দে রাজি হল। তেন্দেরা ধীর পায়ে টিলার ওপর লোকটির ঘরে গিয়ে তার স্ত্রীকে বিনয় সহকারে কুশল জিজ্ঞেস করে, খুশি করল। তারপর বলল, বৌদি দেখ, দাদা মানে তোমার স্বামী একটু আগে আমার কাছ থেকে এক

জোড়া হালের মহিষ কিনেছে ঐ দেখ সাদা মহিষগুলি। তোমার নিকট থেকে মহিষ দুটোর দাম দুশো টাকা নেবার জন্য দাদা পাঠিয়েছে, তুমি আমাকে দুশো টাকা দাও। তখন স্ত্রী লোকটি উত্তরে বলল, কি যাতা বলছ, আন্দাজে কেন টাকা দেব? তেন্দেরা বলল, তাহলে আমি তোমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করছি, দেখ সে কী বলে। তেন্দেরা ডাক দিয়ে লোকটিকে বলল, দাদা, কথামত তোমার স্ত্রী দিচ্ছে না। এই কথা শুনে লোকটি রাগত স্বরে জোরে জোরে বলল, আরে দাও, দাও। অগত্যা স্ত্রী লোকটি বাক্স থেকে তাড়াতাড়ি বের করে দুশো টাকা দিয়ে দিল। তেন্দেরা টাকা পাওয়া মাত্রই সেখান থেকে চম্পট দিল-দূরে, অনেক দূরে। হাঁটতে হাঁটতে সাত গাঙ সাত পাড়া পার হয়ে এক বাজার থেকে সুগন্ধি তেলের বোতল, আয়না, চিরনি এবং অন্যান্য প্রসাধনী সামগ্রী কিনে থলে ভর্তি করে নিল। একদিন সাঁঝের বেলা শামুকছড়ি পাড়ে এক পাড়ায় এসে পৌছল তেন্দেরা। পাড়ার এক পাশে একটি মাচাংঘর দেখে তার উঠানে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরে এক প্রৌঢ়া ও একজন তরুণী। মা ও মেয়ে। মা মেয়েটিকে নদী থেকে পানি আনতে বলছে-কিন্তু মেয়েটি সাঁঝের বেলায় একা পানি আনার জন্য যেতে ভয় পাচ্ছে। তেন্দেরা তরুণীকে দেখে পছন্দ করল। প্রৌঢ়া মহিলাকে মাসী সম্বোধন করে কুশল জিজ্ঞাসা করল। প্রৌঢ়া মহিলা বিস্মিত হয়ে তেন্দেরাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে গো! আমাকে কেন মাসী ডাকছ, আমার তো এ জন্মে কোন বোন নেই। তুমি কোত্থেকে এলে? তেন্দেরা বিনীতভাবে বলল, আমি তোমাকে আমার মায়ের মতই দেখছি। আমার মায়ের চেহারা ঠিক তোমার মত। যা হোক আমি তোমাকে মাসি বলেই ডাকব। মাসী আমাকে কলসিটা দাও, আমি পানি এনে দিচ্ছি। মা ও মেয়ে উভয়ে খুশি হল। তরুণীটি কলসিটি তেন্দেরার হাতে দেওয়ার সময় তেন্দেরা তার থলেটি তরুণীর হাতে দিয়ে বলল, বোন এই থলেতে যা আছে সব তোমার জন্য এনেছি, তুমি রেখে দাও। তেন্দেরা কলসি ভরে পানি নিয়ে উঠানে পৌছার আগে থেকে প্রৌঢ়া বকবক করছিল। তেন্দেরার কানে গেল প্রৌঢ়ার কথা গুলো- কোথা থেকে কে আসল এই সাঁঝের বেলা। তাকে রাত্রে থাকতে দেব কিভাবে? তেন্দেরা মনে মনে ভাবল

তাহলে তাকে কি এখানে থাকতে দেবেনা? সে ফন্দি আঁটতে লাগল কিভাবে এই ঘরে থাকা যায়? পানির কলসি ঘরে তুলে দিয়ে মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, মাসীমা কী কী কাজ আছে আমাকে দাও আমি করে ফেলি। আমাকে অন্য ঘর খুঁজতে হবে থাকার জন্য। মহিলা বুঝল তেন্দেরার এখানে থাকার ইচ্ছা নেই, অথচ কাজ করে দিতে বলছে। তখন তেন্দেরাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথা থেকে আসছ? কে তুমি? তেন্দেরা জবাব দিল সে, আঙু জালিম্বরের নাতি। তখন মহিলার মনে আগের কথা স্মরণ হল, ভাবতে লাগল সে। জালিম্বর আঙু তার ছেলে চিজিগুলার জন্য তাকে বৌ ঠিক করেছিল। কিন্তু যেদিন বিয়ে হবে তার আগের রাতে বাগল্যার সঙ্গে সে পালিয়ে গিয়েছিল। ছয়/সাত বছর সুখে ঘর করে একমাত্র কন্যা কুকলিকমালা জন্ম গ্রহণ করে এবং তার জন্মের এক বছর পর বাগল্যা মারা যায়। প্রৌঢ়া ফুলরেণু তেন্দেরার বাপের নাম জিজ্ঞেস করতেই তেন্দেরা জবাব দিল, তার বাপের নাম গুলা। এবার ফুলরেণু বলল, তুমি চিজিগুলার ছেলে তাহলে? তেন্দেরা হ্যাঁ বলল। ফুলরেণু মনে মনে ভাবল তার সঙ্গে চিজিগুলার বিয়ে হলে হয়ত তেন্দেরা তার গর্ভেই জন্মাত। একটু ক্ষণ ভেবে তেন্দেরাকে বলল, এই সাঁঝের বেলা আর কোথায় যাবে, এখানেই থাক। এর আগে কোনদিন কোন ছেলে বা পুরুষকে আমাদের ঘরে থাকতে দেয়নি, আমার মেয়ে কুকলিকমালা।

মেয়ে কুকলিকমালাকে তেন্দেরাসহ তিনজনের ভাত রাঁধতে বলল ফুলরেণু। কুকলিকমালা ইতোমধ্যে তেন্দেরার দেওয়া থলে থেকে সুগন্ধি তেল মাথায় দিয়ে আয়না দেখে চুল আঁচড়িয়ে মনের মত সেজেছে। সে কোন কথা না বলে ভাত রাঁধতে শুরু করে। তেন্দেরার আগমনে সে কি খুশি হয়েছে?

একদিন দুদিন থেকেও তেন্দেরা ঘর থেকে চলে যাওয়ার নাম করল না। মা আর মেয়েও উচ্চবাচ্য করেনি। তেন্দেরা ফন্দি আঁটে কিভাবে কুকলিকমালাকে বৌ করে ঘরে নিয়ে যাবে। ফুলরেণু মাঝে মাঝে ভাবে, চিজিগুলা ভালভাবে কথা বলতে পারে না। জিহ্বায় যেমন জড়তা আছে তেমনি জড়বুদ্ধি সম্পন্ন। তার ছেলে তেন্দেরার বুদ্ধিইবা

কত হবে, আর এই তেন্দেরা তার মেয়ে কুকলিকমালার জামাই হবে কিভাবে? ফুলরেণু একদিন রাত্রে তেন্দেরাকে বলল, তুমি দেখছি এখান থেকে চলে যাবার নামও করছনা, এভাবে থাকলে লোকে বদনাম করবে। তুমি আমার জন্য তিনটা জিনিস নিয়ে আস, যদি নিয়ে আসতে পার তবে এখানে থাকতে পারবে এবং আমার মেয়ে তোমাকে পছন্দ করলে তার সাথে তোমাকে বিয়ে দেব। আর যদি তিন দিনের মধ্যে এ জিনিসগুলি আনতে না পার তবে এখান থেকে চলে যাবে বুঝলে? সেই তিনটা জিনিস হল- (১) বোঁটাহীন ফল, (২) যে ফলের বিচি বাইরে এবং (৩) যে জিনিস এক বাটি খেয়েও সেই বাটি পূর্ণ থাকে সেই জিনিসে। এই তিন দ্রব্যের নাম শুনে তেন্দেরা বোকা বনে গেল। আসলে সে ঐগুলি চিনে না। সে হতাশ হয়ে গেল। তেন্দেরা ম্লান মুখে কুকলিকমালাকে বলল যে, সে এখান থেকে চলে যাচ্ছে। কুকলিকমালা তেন্দেরাকে পছন্দ করে ফেলেছে তাই তেন্দেরাকে এই তিনটি দ্রব্য কী কী এবং কোথায় পাওয়া যায় তার সন্ধান দিল। সে বলল, তুমি চিন্তা কর কেন? এগুলো নিয়ে আস, যাও। সে বলল, আমাদের ঘরের পাশে যে ছড়া তার নাম শামুকছড়ি। এই ছড়ার উজানে যেতে যেতে ডানে একটা ছড়া দেখবে তার নাম তামছড়ি। সেই ছড়ার দুধারে অনেক ফল গাছ। ওগুলো তাম গাছ। দেখবে তাম (কাজু বাদাম) ধরে আছে গাছে। ফলগুলোর বাইরে বিচি। এখান থেকে তাম পেড়ে নিয়ে আসার সময় দেখবে ছড়াতে অনেক শামুক। সেই শামুক কুড়িয়ে নিয়ে আসবে। যাও, দেরি করনা। তেন্দেরা তার কথামত গিয়ে দেখে সত্যই গাছে তাম ফল ঝুলতেছে। সে পাকা তাম ফল এক থলে নিয়ে আসার সময় এক থলে শামুকও কুড়িয়ে নিল ছড়া থেকে। তখন দুপুর হয়ে গেছে। ঠিক তখন কুকলিকমালার মুরগিটা কক কক্ কতাক্- কক্ কক্ কতাক করে ঘরের বেড়ায় টাঙ্গানো খোপ থেকে নেমে গেল। তেন্দেরা সেখানে পৌছলে কুকলিকমালা তাকে ঐ খোপ থেকে মুরগির পাড়া ডিম নিয়ে আসতে বললে তেন্দেরা ঠিক ঠিক ডিমটা নিয়ে এল। এবার কুকলিকমালা তেন্দেরাকে ঐ তিনটা জিনিসসহ তার মার কাছে নিয়ে গেল। ইশারায় ঐসব জিনিস তার মাকে দিতে বলল কুকলিকমালা। ফুলরেণু তিনটা জিনিস পেয়ে খুশি

হল। তখন কুকলিকমালা তেন্দেরাকে বলল ডিম হচ্ছে বোঁটাহীন ফল, তার কোন বোটা নেই। তামের বিচি ফলের বাইরে। ফলের নিচে ঝুলে থাকে। আর শামুক একবাটি খেলেও (তার সাঁশ খাওয়া যায়) খোলশগুলো পড়ে থাকে-কাজেই একবাটি খেলেও এক বাটিই অবশিষ্ট থাকে। তেন্দেরা কুকলিকমালার কথা মত বুঝিয়ে বলল। ফুলরেণু খুশি হল। কিন্তু তা সত্বেও তার মেয়ে কুকলিকমালাকে চিজিগুলার ছেলে তেন্দেরার জন্য বৌ দিতে রাজি নয় ফুলরেণু। কুকলিকমালা জানে তার মা ফুলরেণু তার বাবা বাগল্যার সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করেছিল, কাজেই তার মা যদি পালিয়ে গিয়ে তার প্রেমিককে বিয়ে করতে পারে, সে কেন তেন্দেরার সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করতে পারবেনা, ভাবে কুকলিকমালা। এক রাত্রে সত্যি সত্যি তেন্দেরার হাত ধরে পালিয়ে গেল কুকলিকমালা। তেন্দেরা কুকলিকমালাকে নিয়ে সোজা ঘরে ফিরে এল। গুলাগুলি ছেলে আর ছেলের বৌ দেখে মহা খুশি হল।

কিছুদিন পর গুলা তেন্দেরাকে নিয়ে পাড়ালিয়াদের সঙ্গে কাট্টনে গেল। নৌকার কাট্টন। তারা এক মাসের খোরাকি নিয়ে দেড় দিনের হাঁটা পথের গভীর বনে চলে গেল। ঘরে রইল গুলি আর তেন্দেরার নববধু কুকলিকমালা। একমাসের প্রায় শেষ, কিন্তু নৌকার কাজ এখনো অনেক বাকি। এদিকে খোরাকিও প্রায় শেষ হয়ে আসছে। তাই তেন্দেরা বাড়ি ফিরল খোরাকি নিয়ে যাবার জন্য। বাড়ি ফিরে দেখল তার মা ভয়ঙ্কর অসুস্থ। কুকলিকমালা কী করবে দিশেহারা হয়ে আছে। তেন্দেরা বৈদ্য এনে তার অসুস্থ মায়ের চিকিৎসা করাল। কিন্তু কয়েকদিন পর তার মা গুলি মারা গেল। তেন্দেরা তার বাবা গুলাকে খবর দিতে পারলনা- তার মার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করল। এদিকে খোরাকি নিয়ে না গেলে তার বাবা উপোসে মরবে, আর খোরাকি নিয়ে কাট্টনে তার বাবার কাছে গেলেও ঘরে কুকলিকমালা একা থাকতে পারবেনা। তাই একদিন সে ফুলরেণুকে তেন্দেরার নিজেদের ঘরে আনতে গেল। তেন্দেরা অবশ্য ভেবে নিয়েছে-ফুলরেণু তাদের ঘরে কোনদিন যাবেনা। তাই ফুলরেণুর কাছে

পৌঁছামাত্র হাউ মাউ করে কেঁদে বলল, আমরা বাপবেটা নৌকার কাউনে গিয়েছিলাম-সেখানে নৌকার কাজ অর্ধেক করে বাবা গুলা মারা গেছে আর সেদিন মা গুলিও মারা গেল। এখন নৌকাটার কাজ সম্পন্ন করে নিয়ে আসতে হবে। বিক্রি করলে টাকা পাব। তাই আমি কাউনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ঘরে কুকলিকমালা একা থাকবে কিভাবে? আপনি আমাদের বাড়িতে চলে আসেন। তেন্দেরার কথা ফুলরেণু ভেবে দেখল। অমনি সে একা থাকা পছন্দ করেনা-এখন তার মেয়ের সঙ্গে তাদের ওখানে থাকলে খারাপ কিছু নয়, তাই তেন্দেরার কথায় সে সহজেই রাজি হয়ে গেল। ঘরের জিনিসপত্র যতটুকু পারে তেন্দেরা নিয়ে নিল। ফুলরেণুও তার কাপড় চোপড় ব্যবহার্য দ্রব্যাদি যা পারল সঙ্গে নিয়ে তেন্দেরার ঘরে এসে পৌঁছল। দুদিন পর তেন্দেরা কিছু দিনের খোরাকি নিয়ে কাউনে তার বাবা গুলার কাছে চলে গেল। সে তার মা গুলির মৃত্যুর কথা তার বাবার কাছে গোপন রাখল। সে বরঞ্চ বলল যে, তার মা গুলি ভয়ানক অভিমান করে আছে। এত দীর্ঘ সময় যে কোনদিন প্রবাসে কাটায়নি। এবার দীর্ঘদিন ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রবাসে চলে এসেছে গুলা। দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকায় স্বাভাবিকভাবে স্ত্রীর প্রতি দিওয়ানা হয়ে আছে। ছেলের কথা শুনে মনে মনে খুব আফসোস করল। মনে মনে ভাবল এতদিন প্রবাসে থাকা কি ঠিক হল? তেন্দেরা আবার বলল, তুমি ঘরে গেলে মা তোমার সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, দেখাই দেবেনা। তুমি ঘরে গেলে মা কামরাতেই পড়ে থাকবে দেখো। গুলা মনে মনে ঠিক করল তাতে কী আছে যায়, ঘরে গিয়ে সোজা কামরার ভিতরে গুলিকে জড়িয়ে ধরলে সব অভিমান ভেঙ্গে যাবে গুলির। তাই সে জড়িয়ে ধরবে। মনে মনে ঠিক করল গুলা।

কয়েকদিন পরিশ্রম করে বাপ-বেটা অসম্পূর্ণ নৌকাটি সম্পূর্ণ করে বাড়ির দিকে রওনা দিল। দেড়দিন নদীর পথে নৌকাটি ভাসিয়ে এনে একদিন সন্ধ্যায় বাজার ঘাটে নৌকা ভিড়াল তারা। তেন্দেরা তার পিতাকে বলল, তুমি নৌকাটি বাজারে বিক্রি কর আর আমি আমাদের

কুড়াল, দা এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি ঘরে নিয়ে যাই। মাকে তুমি এসেছ বলে সংবাদ দিব-তাকে তোমার কথা বুঝিয়ে বলব। এই কথা বলে সে ঘরে এল আর গুলা নৌকাটি বিক্রির জন্য বাজারে থেকে গেল।

ঘরে এসে তেন্দেরা ফুলরেণুকে বলল, আমরা নৌকাটা নিয়ে এসেছি, আমি একা পারিনা বলে আমার এক মামাও সঙ্গে এসেছে। তাকে নৌকা বিক্রির জন্য বাজারে পাঠিয়েছি। সে নৌকা বিক্রি করে রূপার টাকা নিয়ে ঘরে আসবে। সে হয়ত ফিরতে রাত হবে। তোমরা খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমাতে পার, আমি আমার মামার জন্য জেগে থাকব। গ্রামে সন্ধ্যা হতে না হতেই লোকজন খাওয়া-দাওয়া করে অনেকেই ঘুমিয়ে পড়ে। তেন্দেরার কথামত তারা সাঁঝের আঁধার হতে না হতে খাওয়া-দাওয়া শেষ করল। তেন্দেরা যতদিন কাউনে ছিল, ততদিন ফুলরেণু আর তার মেয়ে কুকলিকমালা ঘরের বারান্দাতে ঘুমাত। আজ তেন্দেরা ঘরে আসাতে কুকলিকমালা আর তেন্দেরা ঘরের পিছনের কক্ষ অজলেঙে ঘুমাবে। তেন্দেরা ফুলরেণুকে বলল, আমার মামা এলে খাওয়া-দাওয়া, করে এখানে থাকবে। সে বারান্দাতে ঘুমাবে, কাজেই তুমি ভিতরের কামরাতে ঘুমাও।

ফুলরেণু ঘরের ভিতরে বিছানা করে শুয়ে পড়ল। কুকলিকমালা তাদের জন্য অজলেঙে বিছানা প্রস্তুত করে তেন্দেরার কথিত মামার জন্য বারান্দাতে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

গুলা বাজারে নৌকাটি বিক্রি করে রাত হলে রূপার টাকা নিয়ে খুশি মনে ফিরে এল। গুলার মনে আছে, তেন্দেরা বলেছে গুলি তার প্রতি অভিমান করে আছে। গুলা ঘরে ফিরে তেন্দেরা আর কুকলিকমালাকে দেখল কিন্তু গুলিকে দেখলনা। গুলি নিশ্চয়ই অভিমান করে ভিতরে শুয়ে আছে মনে করে গুলা সোজা ভিতরে চলে গেল। তখন সেখানে অন্ধকার। গুলা হাতড়িয়ে ধরতে পেল কে একজন শুয়ে আছে। সে জড়িয়ে ধরল ফুলরেণুকে। ফুলরেণু ঘুম থেকে জেগে হতভম্ব হয়ে হাত পা-ছুঁড়তে লাগল। গুলা ততোধিক জোরে চেপে ধরল ফুলরেণুকে। ফুলরেণু ভুত ভুত বলে চিৎকার করলে গুলা বলতে লাগল-না-না আমি ভূত নই। ফুলরেণু ভয়ে গুলাকে জোরে জড়িয়ে

ধরল। তাদের এই হৈ চৈ কালে তেন্দেরা আর কুকলিকমালা বাতি নিয়ে সেখানে হাজির হল। বাতির আলোতে ফুলরেণু দেখল গুলাকে আর গুলা দেখল ফুলরেণুকে। উভয়েই হতভম্ব। লজ্জায় তাদের মুখ লাল হয়ে গেল। তাদের এ অবস্থা দেখে তেন্দেরা বলল, তোমরা এভাবে জড়াজড়ি করেছ একথা লোকে জানতে পারবে। কলঙ্কের একশেষ হবে। তার চেয়ে উভয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়া ভাল। গুলা আর ফুলরেণু কিছুই বলতে পারলনা। তাদের স্মরণ হল- কৈশরেই তো তাদের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। তখন হয়নি-এখন শেষ বয়সে হলে ক্ষতি কী?

-০-

[পচ্ছন-রূপকথা। চিজি- (তুলনীয়) খোকা, গুলা-ফল/fruit.]

দুলুক্কুণ্ডী

(দুলু কুমারী)

অতীতে রোয়াঙ্গ দেশে এক ধনী দম্পতি ছিল। তাদের সংসারে সাত ছেলের পর জন্মগ্রহণ করে এক মেয়ে। তারা তার নাম রাখে দুলুক্কুণ্ডী অর্থাৎ দুলুকুমারী। সবাই ডাকে দুলুক্কুণ্ডী। একমাত্র মেয়েটার জন্য তাদের খুব স্নেহ, মায়া, মমতা স্বাভাবিকভাবে বেশি। তারা তাকে খুব ভালবাসে। এই ধনী দম্পতির মৃত্যু হল একই দিনে। মৃত্যুকালে তাদের সব সম্পত্তি দিয়ে যায় তাদের সবচেয়ে স্নেহের কন্যা দুলুক্কুণ্ডীকে। সাত ছেলেকে বলে যায়, তোমাদের বোনকে আদর, যত্ন করবে, তাহলে এই সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে। তখনকার দিনে পিতা-মাতার কথার কেউ অবাধ্য ছিলনা। তাদের বাড়ি ছিল সমুদ্রপাড়ে। সাত ভাই সপ্তডিঙা নিয়ে বাণিজ্য করে প্রচুর ধন-সম্পত্তি আয় করে। মা নেই বাপ নেই বলে ছোট বোন দুলুক্কুণ্ডীর কোন কিছুর প্রয়োজন হলে, কে আগে সে প্রয়োজন মিটাবে তা নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলে সাত ভাইয়ের মধ্যে। দুলুক্কুণ্ডীর যাতে কোন প্রকার কষ্ট না হয় এজন্য সাতভাই সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

সাত ভাইয়ের সাত বৌ ছিল। এই সাতবৌকে আনা হয়েছে সাত গ্রাম থেকে। সাতভাই অর্থ উপার্জন করে, সাতবৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে বসে খায়। দুলুক্কুণ্ডী বসে থাকেনা অলস হয়ে। খুব ভোরে উঠে উঠান ঝাট দেয়, পানি নিয়ে আসে কুয়ো থেকে। কিন্তু তার সাত ভাই জানতে পারলে তারা কাজ করতে দেয়না স্নেহের বোনকে। সাত বৌ তাতে মরে হিংসায়। সাত ভাই সব সময় ঘরে থাকেনা, তারা কাজে যায় এদিক ওদিক। এই অবসরে সাত বৌ যুক্তি করে দুলুক্কুণ্ডীকে নানা কাজ করতে দেয় আর উচ্ছিষ্ট খাবার খেতে দেয়। সাত ভাইয়ের কোন একজন থাকলে দুলুক্কুণ্ডীকে সে চোখে চোখে রাখে। তখন সাত বৌয়ের কেউ তাকে কাজ দিতে পারেনা।

একসময় সাত ভাই মিলে সপ্তডিঙা সাজিয়ে সওদায় চলে গেল। তারা যাবার সময় সাত বৌকে বলে গেল দুলুক্কুণ্ডীকে যেন কোন

কষ্ট না দেয়। চুপে চুপে দুলুক্কুঙীকে বলে গেল সাবধানে থাকতে এবং সাতবৌ তার প্রতি কি রকম ব্যবহার করে তা গোপন করে রাখতে- তারা ফিরে আসলে যেন সব বলে দেবে। এরপর নাফ নদী পাড় হয়ে অকুল সমুদ্রে সপ্তডিঙা সাতটা দ্বীপের মত ভেসে চলে গেল নানা রাজ্যের নগরে বন্দরে। নানা সওদা ডিঙা ভরে নিয়ে চলেছে তারা। বিকিকিনি করতে করতে অনেক সময় কাটিয়ে দিতে লাগল। এদিকে ঘরে তার সাতবৌদি দুলুক্কুঙীকে বসে থাকতে দেয়না। খুব ভোরে ঘুম থেকে তাকে জাগিয়ে তোলে; উঠোন পরিস্কার করতে বলে, পানি নিয়ে আসতে বলে। দুলুক্কুঙী বিনাবাক্যে সব কাজ করে চলে। প্রতিদিন ছোট-বড় কত কাজ করতে হয় তাকে। বৌদিরা ঠিকমত ভাত খেতে দেয়না, ছেঁড়া কাপড় পরে দিন কাটাতে হয়। দুলুক্কুঙী সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করে। সাত ভাইয়ের রেখে যাওয়া ধন সম্পদ সাত বৌ ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে বসে খায়।

একদিন আকাশে দেখা গেল এক মস্তবড় সারাল্য-চিল। মুখে মাঝারী আকৃতির একটি হাঙ্গর মাছ নিয়ে সমুদ্র পাড়ে অলসভাবে উড়তে উড়তে দুলুক্কুঙীদের বাসার উপর উড়ে আসে চিলটা। সবার কনিষ্ঠ ভাইয়ের বৌ প্রথম দেখল চিলটাকে। চিলের মুখে হাঙ্গর মাছ দেখে হৈ চৈ করে উঠল সে। সবাই দেখল বিস্মিত হয়ে। তখন সবার বড় ভাইয়ের বৌ সুর করে চিলের উদ্দেশ্যে বলল:

ও-চিল-চিল সমুদ্র চিল
আমি কেজান আঘি চাআ।
তর মুঅত হাঙর মাছ, সিবা ফেলেই
দুলুক্কুঙীরে নি যা।

অপর ছয় বৌ তার সঙ্গে একই সুরে একই কথা বলতে লাগল। দুলুক্কুঙী তখন সমুদ্র পাড়ে গেছে স্নান করতে। সবে মাত্র স্নান সেরে কাপড় পরতে শুরু করেছে এ অবস্থায় চিলটি বৌদের সামনে হাঙর মাছটি ফেলে দিয়ে দুলুক্কুঙীকে ছোঁ মেরে নিয়ে উড়ে গেল। সাতবৌ হাঙর মাছ পেয়ে কী যে খুশি! তাদের কী উল্লাস! হাঙ্গর মাছটা কেটে তারা টুকরা টুকরা করে কেউ রাঁধল, কেউ তেলে ভাজল, আর

CamScanner

কেউ কেউ শুকিয়ে রাখল। হাঙ্গর মাছের তেলও বোতলে ভরে রাখল কয়েক জন বৌ। এই হাঙ্গর মাছ দিয়ে সাতবৌ বেশ কয়েকদিন মজা করে খাওয়া-দাওয়া করল। তাছাড়া তারা বেশি আনন্দিত হল কারণ দুলুক্কুণ্ডী এখন ঘরে নেই। চিলটি তাকে আকাশ পথে কোথায় নিয়ে গেছে কে জানে? হয়ত যেতে যেতে অনেক উঁচু থেকে সমুদ্রে কোনখানে ফেলে দিয়েছে। তাদের ধারণা দুলুক্কুণ্ডী এখন সমুদ্রের অতল তলে মরে পড়ে আছে। সাত ভাই ফিরে এলেও তাকে আর ফিরে পাবেনা।

চিলটি দুলুক্কুণ্ডীকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবার সময় দুলুক্কুণ্ডী তার সাত ভাইকে স্মরণ করে বিলাপ করতে থাকে। তাকে উদ্ধার করার জন্য আকুল আহবান জানাতে থাকে। চিলটি বোধহয় দুলুক্কুণ্ডীর বেদনা বুঝতে পেরেছে। চিলটি দুলুক্কুণ্ডীকে নিয়ে সমুদ্র পাড়ে এক বিশাল গাছের উঁচু ডালে নিয়ে বসল। গাছের ডালে অনেক্ষণ বসে থাকার পর চিলটি দুলুক্কুণ্ডীকে রেখে কোথায় চলে গেল। দুলুক্কুণ্ডী চোখমেলে দেখল গাছটি বিশাল এবং সে বসে আছে অনেক উঁচুতে। এখান থেকে কি ঝাঁপ দেয়া যায়? তার মনে প্রশ্ন জাগে। ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু। আর সমুদ্রতেও পড়তে পারে। এক্ষেত্রে সমুদ্রের অটল পানিতে তলিয়ে যাবে। ঝাঁপ দেওয়া সম্ভব নয় তাই সে চুপচাপ বসে থাকে। এই অবস্থায় চিলটি ফিরে আসল। সঙ্গে খড়কুটা। চিলটি বাসা বাঁধতে আরম্ভ করে দিল। ধীরে ধীরে দুলুক্কুণ্ডীকে ঘিরে ঝোপঝাড় দিয়ে গড়ে তুলল তার বাসা। দুলুক্কুণ্ডী আর কী করে, অগত্যা অসহায়ভাবে বসে রইল। চিলটি মাঝে মাঝে ফল ও অন্যান্য খাবার নিয়ে আসে দুলুক্কুণ্ডীর জন্য। দুলুক্কুণ্ডী সব খেয়ে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে রইল।

দীর্ঘদিন পর দুলুক্কুণ্ডীর সাত ভাই সাতটি ডিঙায় ধন-সম্পদ পূর্ণ করে বাড়িতে নিয়ে এল। সাত বৌ ছেলে-মেয়ে নিয়ে আনন্দে নেচে নেচে তাদের অভ্যর্থনা জানাল। প্রত্যেক ভাই নিজের বৌ আর ছেলেমেয়ের জন্য এনেছে অলংকার, কাপড়, চোপড়, খেলনা আরো কত কিছু।

CamScanner

সাতভাই এসে প্রথমে খোঁজে দুলুক্কুণ্ডীকে। কিন্তু কোথাও না দেখে বলে, অভিমানী বোন, হয়ত অভিমান করে কোথাও লুকিয়ে আছে। কিন্তু সম্ভাব্য সবখানে খুঁজে কোথাও পেলনা। দুলুক্কুণ্ডী তখন সমুদ্রপাড়ে উঁচু গাছের ডালে মাথার উপর চিলের বাসা নিয়ে সুরকরে বিলাপ করে করে বলে চলেছে-

"ও ভাই সাত ভাই
তুমি গিয় সদাইয়ে
মুই আঘং গাছঅ আগাত
মর মাদাত চিল বাহ।"

এই কথা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি সাতভাই। তারা সাত বৌকে প্রশ্ন করে, আমাদের আদরের বোন দুলুক্কুণ্ডী কোথায়? তোমরা কি তাকে মেরে ফেলেছ? কেউ কিছু বলেনা। পরে যখন বৌদের মারধর করার ভয় দেখানো হয় তখন তারা বলল, দুলুক্কুণ্ডী সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। সাতভাই তাদের একথা বিশ্বাস করতে পারেনি। সত্যি সত্যি তিন সত্যি করে সাতবৌ যখন বলল, তখন সাতভাই নেমে পড়ল দুলুক্কুণ্ডীর খোঁজে। জঙ্গলে বন্দরে পাহাড়ে, নদীতে খোঁজার পর কোথাও তার সন্ধান মিলল না।

তারপর সমুদ্র পাড়ে বেলাভূমিতে তারা যখন সেই বিশাল বৃক্ষের নীচে পৌছে হঠাৎ তারা একটি সুর শুনতে পেল:

ও ভাই সাত ভাই
তুমি গিয় সদাইয়ে
মুই আঘং গাছঅ আগাত
মর মাদাত চিল বাহ।

তারা এদিক ওদিক তাকায় কিন্তু কিছুই দেখেনা। হঠাৎ বড় ভাইয়ের দৃষ্টি গেল বিশাল গাছটির উপরের। সে দেখল একটি পাখির বাসা এবং কান পেতে শুনতে পেল সেই বিলাপ ধ্বনি। তারা বুঝতে পারল তাদের আদরের ছোটবোন দুলুক্কুণ্ডীরই এই বিলাপ। তারা সাঁঙার বেঁধে

বিরাট গাছের আগায় মগডালে উঠে দুলুক্কুঙীকে দেখতে পেল। আহাঃ কী চেহারা হয়েছে তার। সেই সুন্দর নাদুস দুলুক্কুঙী এখন এক প্রেতমুর্তি ছাড়া কিছু নয়। তারা তাকে নীচে নামিয়ে এনে সমুদ্রে স্নান করিয়ে নতুন পোশাকে সাজাল। সুস্বাদু খাবার খাইয়ে সুস্থ সবল করল। এবার জিজ্ঞেস করল তার পরিণতি এরকম হল কিভাবে। দুলুক্কুঙী একে একে সব খুলে বলল তার সাত বৌদির অত্যাচারের কথা। একটা হাঙর মাছের বদলে তাকে চিলের মুখে সঁপে দিয়েছিল শুনে সাত ভাই রাগে ফুঁসে উঠল। একটি কাঠের সিন্দুক বানিয়ে তাতে দুলুক্কুঙীকে ঢুকিয়ে রেখে তারা বাড়ি ফিরল। আর স্ত্রীদের শাস্তি দেবার জন্য ফেরার আগে তারা বোনকে কিছু বুদ্ধি শিখিয়ে দিল। সাত বৌ তখন আনন্দে আত্মহারা। তারা ভাবছে নিশ্চয় তাদের স্বামীরা তাদের জন্য আবার অলংকার, পোশাক, পরিচ্ছদ, ধনরত্ন আর ছেলেমেয়েদের জন্য খেলনা নিয়ে এসেছে। সাত ভাই তখন সিন্দুকটি উপরে তুলে সাত বৌকে বলল, তোমরা সিন্ধুকের তলায় মাথা পেতে রাখ দেখবে সুগন্ধি তেল গড়িয়ে পড়ছে। তাদের কথায় সাত বৌ আনন্দিত হয়ে একে একে মাথা নিচু করে সিন্দুকের তলায় মাথা রাখল। এরপর হঠাৎ ছি ছি করে সবাই একসঙ্গে বলল-এ কী! এ যে প্রস্রাবের গন্ধ! আসলে ভাইদের পরামর্শে দুলুক্কুঙীই প্রস্রাব করে দিয়েছে।

যখন সিন্দুক খোলা হল তখন নতুন পোশাকে সজ্জিতা দুলুক্কুঙী বেড়িয়ে আসল! তখন সাত বৌ এর মুখে কোন কথা নেই। এ কী দেখতে পাচ্ছে তারা! দুলুক্কুঙীকে চিলে নিয়ে গেছে সেই কোন কালে! এ যে অসম্ভব! দুলুক্কুঙীকে জীবন্ত দেখেও বিশ্বাস করতে পারলনা সাতবৌ!

তখন সাত ভাই সাত বৌকে আবার জিজ্ঞাসা করল, বল, দুলুক্কুঙীকে তোমরা কী করেছ? সত্য করে বল, নইলে তোমাদের জ্যান্ত রাখবনা। শেষে সবচেয়ে ছোট বৌ আসল ঘটনার কথা প্রকাশ করল। এক হাঙরের বদলে তারা দুলুক্কুঙীকে চিলের মুখে সঁপে দিয়েছে। কথাটা বিশ্বাস করল সাতভাই। কেননা বিরাট গাছের উপর চিলের বাসায় পাওয়া গেছে দুলুক্কুঙীকে। চিল তাকে সমুদ্রে ফেলে

দেয়নি। গাছের আগায় দুলুক্কুণ্ডীর মাথায় বাসা বেঁধে রেখে দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

সাতভাই কোন কথা না বলে সাত বৌকে একটি ডিঙায় তুলে ডিঙাটি ফুটো করে সমুদ্রে ঠেলে দিল। তাদেরকে বলল, যাও তোমরা এবার সওদাতে যাও। ফুটো ডিঙা দিয়ে কি সওদাতে যেতে পারে? গভীর সমুদ্রে সাত বৌ অটলে ডুবে গেল।

তারপর সাতভাই আবার ভাল দেখে সাত গ্রাম থেকে পছন্দমত বিয়ে করল। এবার সাত ভাইয়ের সাত বৌ স্বামীদের চেয়েও অধিক ভালবাসা আর স্নেহ দিয়ে দুলুক্কুণ্ডীকে আদর যত্ন সহকারে লালন পালন করতে লাগল।

-০-

CamScanner

বনমানুষের সঙ্গে বসবাস

পার্বত্য চট্টগ্রাম এক সময় দুর্ভেদ্য গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বনে হাতি, গন্ডার, গয়াল, বুনো মহিষ, সম্বর হরিণ, বাঘ, ভালুক, হরিণ, শূকর প্রচুর পরিমাণে ছিল। আর ছিল বনমানুষ। শত বর্ষ আগেও বনমানুষের দেখা পাওয়া যেত। পাথুরে গর্তই ছিল বন মানুষের আস্তানা বা আশ্রয়স্থল। সাধারণতঃ যেখানে পানি সহজলভ্য এবং পাথরের পাহাড় থাকে, সেই সব জায়গায় বনমানুষ বাস করে। কেননা, ছড়া বা ছোট ছোট স্রোতস্বিনীতে মাছ, কাঁকড়া, ব্যাঙ পাওয়া যায়, আশে পাশের জঙ্গলে বন্য ফলের অভাব হয় না। পাথরের পাহাড়ে তারা গর্ত করে আশ্রয় স্থল তৈরি করে থাকতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে বনমানুষের গর্ত আছে বলে জানা যায়। বর্তমানে বিলাইছড়ি থানাধীন ১৩০নং বারুদগোলা মৌজার গাছকাটা ছড়ায় বনমানুষের দুটো গর্ত আমি নিজে দেখেছি। তখন অবশ্য বনমানুষ ছিলনা। এখন সে গর্তসমূহ কাপ্তাই বাঁধের জলে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে। গর্তগুলো ছোট ছড়ার পাড়ে পাথুরে দেয়াল খনন করে যেন কোন রাজমিস্ত্রী তৈরি করেছে বলে মনে হয়। গর্তের দেয়ালে লোহার বাটালি দিয়ে কাটা হয়েছে বলেও মনে হয়। স্থানীয় লোকেরা বলে, ওগুলো বনমানুষের নখের আঁচড়ের চিহ্ন। গর্তগুলো ভিতরের দিকে অনেক দূর প্রশস্ত। এতে অনায়াসে একাধিক বনমানুষ স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে।

বনমানুষ সম্পর্কে নানা রকম গল্প শোনা যায়। কোন কোন সময় গ্রামের লোকেরা দল বেঁধে বনমানুষের আস্তানায় হানা দিয়ে বনমানুষ ধরার যেমন গল্প শোনা যায় তেমনি বনমানুষেরা কোন মানুষকে অপহরণ করেছে এ ধরণের কথাও শোনা যায়।

১০০ নং ওয়াগ্গা মৌজার ওয়াগ্গা ছড়ার সাপছড়ি নামক স্থানে এধরনের রোমাঞ্চকর একটি ঘটনা ঘটে। এটি মাত্র ষাট/সত্তর বছরের আগের ঘটনা। সাপছড়ি আঁকাবাঁকা বাঁকের যেখানে সবচেয়ে দীর্ঘ স্থান সেই বাঁকে ছড়া থেকে সামান্য দূরে একটি বিশাল কাল পাথর।

CamScanner

পাথরটি সামান্য উচুঁজায়গায় অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা পাথরটিকে বলত "ব-শীল্লোয়া" অর্থাৎ বড় শিলা বা পাথরটি। এই পাথরের নীচের দিকে মাটির সঙ্গে সংলগ্ন একটি সুরুঙ্গ দেখতে অনেকটা বাড়ির মত। এখানে একটি বনমানুষ বাস করত। এবার ঐ বনমানুষ সম্পর্কে শোনা গল্পটি বর্ণনা করা যাক।

তখন কালো পাথরটির কাছাকাছি কোন জনবসতি ছিল না। আশেপাশে ছিল গভীর জঙ্গল। এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে ওয়াগ্নার সাথে সাপছড়ি যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানে কয়েক পরিবার বাস লোক করত। আর সাপছড়ির উৎস স্থানে উঁচু পাহাড়ে জুম করার জন্যও লোকজন বসবাস করত। পাহাড়ের চূড়ায় পাড়া গড়ে তুললে তাকে "মোন-আদাম" বলা হয়। মোনআদাম আর সাপছড়ি মুখের পাড়ায় লোকজন চলাচল করত ছড়ার পথ বেঁয়ে, তাছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। ছড়াটির জল ধারাটি ছিল ক্ষীণ। বর্ষাকালেও পানি কম থাকে, যতক্ষণ বৃষ্টি হয় ততক্ষণ ঢল নামে। তখন চলাচল কঠিন হত। আর বৃষ্টি থেমে গেলে ধীরে ধীরে জল কমে আসে। পূর্ববৎ চলাচল করা সহজ হয়। এই ছড়ার পথ তেমন সহজগম্য ছিলনা। পথটি সর্বত্র পিচ্ছিল শিলায় পরিপূর্ণ, অতি সাবধানে হাঁটতে হয়। অন্য কোন পথ না থাকায় লোকজনকে এই পথে চলাচল করতে হত। বনমানুষের আস্তানা এই পথ থেকে মাত্র শ-দুশো হাত দূরে। বনমানুষটির সামনে পড়ার ভয়ে লোকজন একা একা কোনদিন এ পথে চলাচল করত না। দলবদ্ধভাবেই চলাচল করত। মাঝে মাঝে যাতায়াতকারীরা অনতিদূর থেকে বনমানুষটি দেখতে পায় ছড়ায় পাথর উল্টিয়ে কী যেন হাতে নিয়ে মুখে পুড়ে। সম্ভবতঃ কাঁকড়া, মাছ, ব্যাঙ জাতীয় প্রাণী হতে পারে। লোকজন দেখলে বনমানুষটি পালিয়ে যেত।

একদিন সকালে সাপছড়ি মুখ পাড়া থেকে আটজন নারী-পুরুষ মোনআদামে নিমন্ত্রণ খেতে রওনা দেয়। তাদের মধ্যে তিন জন যুবতী, দুজন যুবক আর তিন জন বয়স্ক লোক। যুবতীদের মধ্যে পাড়ার কার্বারীর মেয়ে "রত্নমালাও" আছে। সে রূপ লাবণ্যবতী।

দশদিনের পর তার বিয়ে হওয়ার দিন ধার্য হয়ে আছে। বাবা-মা আদর করে তার নাম রত্নমালা রেখেছে। তার স্বাস্থ্য ভাল, হৃষ্ট-পুষ্ট। বলা যায় সুধাম দেহের অধিকারিনী। গায়ের রঙ ফর্সা।

পাড়া থেকে বনমানুষের আস্তানার কাছাকাছি গিয়েই তারা বনমানুষটিকে দেখতে পেল। বনমানুষটি ছোট-বড় পাথর উল্টিয়ে মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি ধরছে। পথের ওপর বনমানুষকে এইভাবে দেখে গমনকারীরা থমকে গেল। ইতোপূর্বে বনমানুষটি এই রকম দলবদ্ধভাবে মানুষ দেখলে পালিয়ে যেত। কিন্ত এবার গেলনা। বরঞ্চ তাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। লোকগুলো মোনআদামে যাওয়া দুঃসাধ্য মনে করে নিজেদের পাড়ায় ফেরার জন্য তাদের গতি পরিবর্তন করে পাড়ার দিকে দৌড়াতে লাগল। ছড়া বা পথের ওপর নানা আকারের পিচ্ছিল শিলা থাকায় তারা আছাড় খেয়ে খেয়ে কষ্ট করে দৌড়াতে লাগল। বহু কষ্ট স্বীকার করে তারা যখন কিয়দ্দুর এসে বনমানুষের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এই বিশ্বাসে এক জায়গায় একত্রিত হল, তখন দেখা গেল রত্নমালা আসেনি। ভয় এবং দুশ্চিন্তা নিয়ে তারা অনেকক্ষণ রত্নমালার জন্য অপেক্ষা করল। চিৎকার করে ডাকাডাকি করল। কিন্তু রত্নমালার দেখাত নেই-ই কোন সাড়া শব্দও পাওয়া গেলনা। তাদের মনে সন্দেহ হলো, বনমানুষটি কি রত্নমালাকে ধরে ফেলেছে? ধরে তার কি আস্তানায় নিয়ে গেছে? তাকে কি খেয়ে ফেলবে বনমানুষটা? তারা পাড়ায় ফিরে গিয়ে জানাল, বনমানুষটা তাদের তাড়া করেছে এবং সম্ভবত রত্নমালা তার কবলে আটকে গেছে। কার্বারী, তার স্ত্রী আর বাড়ির সবাই এই আশংকা করে অনেক কান্নাকাটি করল। তারা ধরেই নিল যে, রত্নমালাকে বনমানুষটি মেরে খেয়ে ফেলবে।

পাড়ার বিশ/ত্রিশ জনের একদল যুব বয়সের লোক দা. বল্লম, হাতিয়ার নিয়ে সাবধানে বনমানুষের আস্তানায় গেল রত্নমালার সন্ধানে। উদ্দেশ্য তাকে উদ্ধার করবে। তারা আশেপাশের অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করল। রত্নমালা কিংবা বনমানুষটির কোন সাড়া শব্দ তো নেই- কেবল "ব- শিল্লোয়ার" সম্মুখে একটি নতুন পিনন আর একটি খাদি অবিন্যস্তভাবে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেল।

বনমানুষের ভয়ে লোকগুলো যখন পাড়ার দিকে ফেরার উদ্দেশ্যে দৌড়তে থাকে তখন রত্নমালা সবার মধ্যেই ছিল। কিন্তু পিচ্ছিল শিলায় বার বার আছাড় খেয়ে সবার পেছনে পড়ে যায়। অন্যান্যরা খুব দক্ষতার সঙ্গে পিচ্ছিল শিলার ওপর দিয়ে দৌড়ে পালাতে সক্ষম হয়। কিন্তু রত্নমালা দুর্ভাগ্যজনকভাবে সবার পিছনে পড়ে যায়। একা পেয়ে বনমানুষটি তাকে ঝাপটে ধরে ফেলে এবং বুকে জড়িয়ে নিয়ে দ্রুত তার আস্তানায় গিয়ে ঢুকে পড়ে। তখন রত্নমালার পরিহিত পিনন, খাদি খুলে গেলে "ব-শিল্লোয়ার" কাছাকাছি পড়ে যায়। অনুসন্ধানকারীরা এই পিনন-খাদি দেখে পুরোপুরি নিশ্চিত হল যে, বনমানুষটি রত্নমালাকে তার আস্তানায় নিয়ে গেছে। রত্নমালার পিতা-মাতা আর পাড়াবাসী নিরুপায়, তাকে উদ্ধার করা তাদের পক্ষে সাধ্য নয়।

বনমানুষটি রত্নমালাকে যখন ধরে ফেলে তখন সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সেজন্য সঙ্গীদের ডাকতে পারেনি বা চিৎকারও করতে পারেনি। বনমানুষটি তাকে জড়িয়ে ধরলে "ব-শিল্লোয়ার" কাছে রত্নমালার পিনন খাদি খুলে পড়ে যায়। জ্ঞান ফিরে এসে রত্নমালা শান্ত হয়ে রইল। এই অবস্থায় তার আত্মসমর্পণ ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই। রত্নমালা দানবটির হাত থেকে মুক্ত হবার কোন প্রয়াসই করলনা। দানবটির কাছে আত্মসমর্পিতা হয়ে রইল সে। দানবটি রত্নমালার কোন ক্ষতি করল না। তাকে তার জীবনসঙ্গিনীই করে নিল। বনমানুষটি গর্তের বাইরে কোথাও গেলে গর্তের মুখে বড় বড় পাথর দিয়ে রত্নমালার পালিয়ে যাবার পথ বন্ধ করে দিত। রত্নমালার মনে হল, লোকালয়ে ফিরে যাবার কোন উপায় নেই। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন কারো সংগে মিলিত হবার আশাও নেই। এই বনমানুষটিই তার আশ্রয়, ক্ষুধার তাড়নায় বনমানুষটির দেয়া খাদ্যে সে ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে বাধ্য হল এবং ক্রমে ক্রমে সেই সব খাদ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেল। দানবটি মাঝে মাঝে খাদ্যের সন্ধানে বের হয়, গর্তের মধ্যে বড় বড় পাথর আটকিয়ে দেয়। রত্নমালা "ব-শিল্লোয়ার" ভিতর অধীর হয়ে বসে থাকে। ভয়ও হয় বনমানুষটি ফিরে

এসে কী করে। খাদ্য সংগ্রহ করতে না পেরে তাকেই খেয়ে ফেলবে কি? এরকম দুশ্চিন্তায় থাকে রত্নমালা। এক সময় বনমানুষটি ফিরে আসে, সঙ্গে নিয়ে আছে মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, ব্যাঙ অথবা কোন সরীসৃপ, ফল-মুল। ফিরে এসে রত্নমালাকে আদর করে এবং ঐ সব খেতে দেয়। রত্নমালার ভয় দূর হয়। ক্ষুধার তাড়নায় অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে পেট ভরায় রত্নমালা। বনমানুষটি খুশি হয়ে তাকে আদর করে। লোকালয়ের মানবী রত্নমালা বনমানুষের জীবন সঙ্গিনী হয়ে বনমানবীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে দিন, মাস, এমনকি মাস, বছরও পেরিয়ে যায়। একদিন রত্নমালার গর্ভে জন্ম নিল বনমানুষটির এক বাচ্চা। ইয়া বড় শরীর। বনমানুষটির ভয়ে লোকজন এ কয়েক বছর এই পথে চলা ফেরা বন্ধ করে দিয়েছে। বাচ্চা হবার পরে বনমানুষটি রত্নমালাকে পাহারা দেবার কড়াকড়ি ব্যবস্থা শিথিল করে দিয়েছে। সে জানে লোকজনের আর এ পথে আনাগোনা নেই। এই দানব বাচ্চাকে নিয়েই তার মন ভরে থাকবে রত্নমালার। সে লোকালয়ে মানুষের কাছে ফিরে যাবে না। দুবছর পর বনমানুষটির উৎপাতের কোন খবর পাওয়া যায়নি। লোকজন আবার আনাগোনা শুরু করল এই পথে। রত্নমালা গর্তের বাইরে এসে মাঝেমাঝে লোকজন দেখে। তখন তার পাড়ার লোকজনের কথা মনে পড়ে। তার মন হঠাৎ কেঁদে ওঠে। আবার তাদের সাথে মিলিত হবার আকাঙ্খা জাগে। কিন্তু ভাবে তার কোলে বনমানুষের বাচ্চা, সে মানুষের সঙ্গে একত্রিত হবে কী করে। আত্মীয়-স্বজনরা তাকে কি গ্রহণ করবে? তাই ভাবে বাচ্চাটা রেখে পালিয়ে যেতে... একা গেলে পিতা-মাতা, ভাই-বোন নিশ্চয়ই স্নেহের টানে তাকে গ্রহণ করতেও পারে। এসব নানা জল্পনা তার মনে জাগে। একদিন বনমানুষটা কোথাও বেড়িয়ে গেছে খাদ্যের সন্ধানে। গর্তের মুখ খোলা পেয়ে রত্নমালা বেড়িয়ে এল বাচ্চাটিকে এক জায়গায় রেখে। সে পাড়ার দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করল। মাতৃস্নেহের কারণে পিছনে ফিরে তাকাতেই দেখে বনমানুষটি বাচ্চাটিকে ধরে তার দিকে এগিয়ে আসছে এবং তার ভাষায় গোঁ গোঁ করে বলছে. তুমি চলে

যেয়োনা, চলে যেয়োনা। এই যে তোমার বাচ্চা, এই বলে বাচ্চাটি উপরে তুলে ধরে দেখাতে লাগল। কিন্তু রত্নমালা সে বাচ্চা নিয়ে কী করবে? লোকালয়ে গেলে সে মানবীয় জীবন ফিরে পাবে। ভবিষ্যতে মানুষের সন্তানই তার কাম্য... সে দৌড়াতে থাকে। শেষ বারের মত বাচ্চাটির চিৎকারে সে ফিরে তাকাল এবং দেখল ততক্ষণে বনমানুষটি বাচ্চাটিকে মেরে ফেলেছে। ভীত ও দুঃখিত চিত্তে রত্নমালা লোকালয়ের দিকে দ্রুত পালিয়ে গেল।

[মোন-পর্বত। আদাম-গ্রাম।]

-০-

লাংগেই ডর

এদতঞ্চলের বিশাল বনাঞ্চল একসময় উন্মুক্ত ও অবাধ ছিল। কুকি চিন ভাষাভাষীরাও এ অঞ্চলে বসবাস করত। তাদেরকে মারমা ভাষায় লাংগে বলা হয়। লুসাই হিলেই তাদের মূল বসতি ছিল। এই অঞ্চলে তারা অবাধে বিচরণ করত। এখানে সেখানে পছন্দমত স্থানে তারা অস্থায়ীভাবে বসবাস করত। তাদের এসব বসতি স্থানের নাম এখনো কুকি-ছড়া, কুকি-উদান্যা, কুকি-মোইন নামে পরিচিত।

অতীতে এই অঞ্চলে চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠিদের উপর লাংগেইরা দলবদ্ধভাবে চড়াও হয়েছিল। হঠাৎ এসে পাড়া গ্রাম আক্রমণ করে লুণ্ঠন ও নর হত্যা করত। কিন্তু সাঁতার কেটে নদী পার হবার কৌশল কম জানাতে কর্ণফুলীর মত বড় নদী পার হতে না পারায় পশ্চিম তীরে তেমন অত্যাচার চালাতে পারেনি। এই কারণে কাচালং, সুবলং রাইংখ্যং অঞ্চলই তাদের অত্যাচারের প্রধান অঞ্চল ছিল।

রাইংখ্যং এবং সুবলং নদীর উপত্যকা অঞ্চল উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। তাজিনডং, কেওক্রাডং পর্বত মালার উত্তর পূর্বাঞ্চল হতে ঠেগা-থুম পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এক সময় উপজাতীয় জনগোষ্ঠির লোকেরা স্বাচ্ছন্দে এবং অবাধভাবে বিচরণ করত। এই অঞ্চলে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদের বসতি। লাংগেইরা ইচ্ছাতম এই সব বসতিগুলিতে তাদের উপর আক্রমণ চালাত। তাদের আক্রমণের কয়েকটি জনশ্রুতি নিম্নে বর্ণনা করা হল।

এক

তখন ছিনামোইন নামে একটি পাড়া ছিল। প্রায় ষাট/সত্তর পরিবার লোক এ পাড়ায় বাস করত। এক রাত্রে সমগ্র পাড়াবাসীর প্রায় মাচাং এর নীচে দু একজন করে লাংগেই অবস্থান নিয়েছে। তারা সাধারণতঃ ভোর রাতে লোকজন কাটতে শুরু করে, যাতে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আস্তানার দিকে রওনা দিতে পারে। পাড়ার শেষ

প্রান্তে একটি ঘরের মাচাং-এর তলে মধ্য রাতে কয়েকজন লাংগেই এসে ভোর রাতের জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের সংগে আছে দা, বর্শা, শেল এবং নানা অস্ত্র।

তখন ঘরের ভিতর ঘুমাচ্ছে মাত্র তিনজন। একজন যুবতী, একজন স্ত্রীলোক এবং তার দুবছরের ছেলে। যুবতীর বড় ভাই কাট্টনে গেছে। তারা সন্ধ্যায় খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মধ্যরাতে লাংগেইরা তাদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাদের মাচাং ঘরের তলে এসে যে অপেক্ষা করছে সেটা তাদের জানা ছিল না। তারা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। এক সময় দুবছরের ছেলেটি মূত্র ত্যাগ করলে উপর থেকে সে মূত্র লোহার শেল বা বর্শার উপর পড়ে শব্দ হল। ছেলের মা তখন জেগে গেছে। ইতোপূর্বে ছেলের মূত্রত্যাগে এরূপ কোন শব্দ শোনা যায়নি। ছেলের মা বিস্মিত হয়ে মাচাঙের তরজা চিরে নীচে তাকিয়ে বাইরে জ্যোছনার আধো আলো, আধো ছায়াতে আবছাভাবে দেখে কয়েকজন লোক নীরবে বসে আছে। সে বুঝতে পারল এরা লাংগেই। কারণ ইতোপূর্বে এই রকম ঘটনার কথা শুনেছে সে। ছেলের মা ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে তার ঘুমন্ত ননদের গায়ে হাত দিয়ে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার যুবতী ননদ ঘুমে প্রায় অচেতন হয়ে আছে। ঘুম ভাঙছে না তার। তার বৌদি অনেক কায়দা করে চুপে চুপে জাগাতে চাইল, জোর করে কিংবা উচ্চ স্বরে কথা বলে বা জাগাতে পারছে না। কেননা লাংগেইরা শুনে ফেলবে। অনেক চেষ্টা করেও সে ননদকে জাগাতে পারল না। তাদের ঘর পাহাড়ের ঢালুতে হওয়ায় ঘরের এক কোণ পাহাড় ঘেষে আছে। এই কোণ দিয়ে আনায়াসে ঘর থেকে মাটিতে নামা যায়। সে তার ছেলেকে বুকে নিয়ে চুপে চুপে ঘরের বেড়ার কোণ চিরে পাহাড়ে নেমে পিছনের দিকের ছড়ায় লুকিয়ে রইল।

ভোররাতে লাংগেইরা ঘরে উঠে দেখে যুবতী ঘুম থেকে জেগে আতংকিত অবস্থায় অসহায় হয়ে বসে আছে। লাংগেই দেখে সে চিৎকার শুরু করে দিল, তার বৌদিকে ডেকে বিলাপ করতে লাগল.. ও বৌদি আমাকে একা ফেলে কোথায় গেলে। যাবার সময় কেন

আমাকে সঙ্গে নিলে না? কিন্তু তার বৌদি তাকে ঘুম থেকে জাগাতে কত না চেষ্টা করেছে তা কে বলবে তাকে? শোনা যায় লাংগেইরা নাকি তাকে হত্যা না করে তার হাতের তালু ছিদ্র করে ছোট বেত গেঁথে নিয়ে যায়।

দুই

রাইংখ্যং এর উদালছড়িতে অবস্থিত একটি বিরাট পাড়া লাংগেইরা এক রাত্রে আক্রমণ করতে আসে। সবেমাত্র তারা পাড়া ঘিরে ফেলতে আরম্ভ করেছে। এই কথা জানাজানি হলে, যে যেই দিকে পারে পালিয়ে যেতে থাকে। অচল বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং শিশুদের অন্যান্যরা পিঠে করে নিচ্ছে। অনেক ছেলে-মেয়েও আছে যারা হাঁটছে। তখন সেই দলে একটি ছেলে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। অনবরত কাঁদছেই। অনেক বোঝানো হল, চেষ্টা করা হল তার কান্না থামাতে। কিন্তু কিছুতেই তার কান্না থামে না। লাংগেইরা সেই কান্নার শব্দ শুনেই তাদের অনুসরণ করবে এবং তারা সবাইকে কেটে ফেলবে। পথে অনেক পাথর। ছেলেটি যখন চুপ হচ্ছে না, তখন নাকি একজন বলিষ্ঠ লোক ছেলেকে দুহাতে ধরে উর্ধে তুলে পাথরের উপর দিল এক আছাড়। এতে ছেলেটি তাতে চুপ হয়ে গেল। এইভাবে সেই লোকেরা চুপি সারে পালিয়ে গিয়ে লাংগেইদের হাত থেকে রক্ষা পেল।

তিন

রাইংখ্যং এলাকায় গাছকাটা ছড়া এলাকাটি লাংগেই সর্বপশ্চিমে ছিল। আক্রমণের হাত থেকে এটিও বাদ যায়নি। তারা এখানেও নর হত্যা সংঘটিত করেছিল। লাংগেইরা এখানে তাদের কয়েকটি ঘাঁটি বসায়। কুকি ছড়া, কুকি উদান্যা, কুকি মোইন এইসব জায়গায় তাদের ঘাঁটি গড়ে তোলে এবং তাদের সে সব ঘাঁটির নামে জায়গাগুলোর নামকরণ হয়ে যায়। তাদের বসতিগুলো এক একটি দূর্গ বিশেষ। তারা খুব নিরাপদ জায়গা বেছে নিয়ে বসতি গড়ে তোলে। বস্তুতঃ এগুলো নিরাপদ দূর্গ স্বরূপ। তিন দিকে খাড়া দেয়ালের মত পাথরের পাহাড় থাকায় এ তিন দিক তাদের জন্য নিরাপদ। আর

একদিক খোলা, ওটাই একমাত্র পথ তাদের বসতি থেকে অন্যত্র চলাফেরার জন্য। এই পথটি তারা সারাক্ষণ পাহারা দিয়ে থাকে এবং বড় বড় গাছের গুঁড়িও পাথর বেঁধে রাখে। কোন শত্রু সেই পথে তাদের বসতিতে প্রবেশ করতে চেষ্টা করলে প্রহরীরা ঐসব গাছের গুঁড়ি এবং পাথর গুলি গড়িয়ে দিয়ে শত্রু হত্যা করে। কাজেই তাদের বসতিগুলি তখন বেশ দুর্ভেদ্য ছিল।

গাছকাটা-ছড়ার এই অঞ্চলে বসতি স্থাপনের পূর্বে লাংগেইরা কয়েকবার নরহত্যা অভিযান চালিয়েছিল। এইরকম আক্রমণ পরিচালনার সময় ঘিলামোইনের শীর্ষে অবস্থিত ঘিলাতাক পাড়ায় এক অতি করুণ এবং নৃশংস ঘটনা সংঘটিত করে। মাঝরাতে এসে লাংগেইরা তিরিশ/চল্লিশ ঘর সমন্বিত পাড়াটি ঘিরে ফেলে। মধ্যরাতে লাংগেইরা পাহাড় ঘিরে ফেললেও ঘুমন্ত অবস্থায় পাড়ার কেউ টের পায়নি। একজন বুড়ো টের পায় কিন্তু ততক্ষণে লাংগেইরা লোকজন কাটতে শুরু করে দিয়েছে। কেউ পালাতে গেলে তাকে আগে হত্যা করা হল। আর সুন্দরী দেখে দেখে মরিচা বেত হাতের তালুতে ঢুকিয়ে গেঁথে নিল। সবশেষে, তারা যে বৃদ্ধটিকে পেয়েছিল তার সঙ্গে পাড়ার একটি বৃদ্ধনারীকে মুখোমুখী করে বেঁধে ফেলল। উভয়কে মুখোমুখী করে শক্ত করে বেঁধে রেখে গেল, তাদেরকে হত্যা করল না। তারা নাকি অসহায় ভাবে অনাহারে করুণ যন্ত্রনায় কোমরে আবদ্ধ অবস্থায় কিছুদিনের মধ্যে মানব লীলা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল।

[ঘিলা-গিলা. মোইন-পর্বত]

-০-

ধন্ধ কামাহ্

ধন্ধ একজন সাধারণ মানুষ। বয়স পঁয়ত্রিশ হতে চল্লিশ-এর মধ্যে। এখনো বিয়ে করেনি। তার বাবা-মা বহুদিন আগে মারা গিয়েছে। সে বড় ভাইয়ের সংসারে থাকে। তবে বড় বোনের সংসারেও বছরের প্রায় সিকিভাগ কাটিয়ে দেয়। দাদা আর বোনের পৃথক পৃথক সংসারে নিজেদের ছেলে-মেয়ে আছে। ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা-মার সঙ্গে জুমের কাজ করে। ধন্ধ মোটামুটি তার দাদা আর বড় বোনের সংসারেই ভাগাভাগি করে জীবন কাটাচ্ছে। শৈশব, কৈশোর কাটিয়ে যৌবনও কাটিয়ে চলেছে। সেকালে লেখা পড়া শিখতে কেউ কল্পনা করতে পারেনি। শিক্ষার ব্যবহার তা নেই-ই। তখনকার দিনে সাধারণ মানুষেরা জন্মের পর থেকে অবাধে প্রকৃতির কোলে লালিত হয়। প্রবৃত্তি আর প্রকৃতির সংমিশ্রণে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তাই হচ্ছে তাদের একমাত্র শিক্ষা স্বাভাবিকভাবে তাদের আচরণ হয়ে থাকে অবাধ্য, অসংযত, অনিয়ন্ত্রিত বা স্বেচ্ছাচারী। ক্ষুধার তাড়না অনুভব করে বলে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খায়, খাবার যোগাড় করার জন্য এদিক ওদিক ঘোরে কিংবা কাজ করে, খায়-দায়, ঘুমায় আর নিশ্চিন্তে সময় কাটিয়ে দেয়। প্রবৃত্তির বশে ভাবা, প্রবৃত্তির বশে কাজ করা, প্রবৃত্তির বশে চলা সবই মানুষকে লাগামহীন, উদ্দেশ্যহীন করে আর অনেক সময় দুঃখের পথে নিয়ে যায়। হতাশ মানুষ তখন নিজের জীবন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। ধন্ধ হচ্ছে এরকম একজন সাধারণ দুঃখী যে নিজের জীবন থেকেই নিজেকে প্রত্যাহার করেছে। হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, ভয় প্রাণীর স্বভাব সুলভ বৃত্তি। ধন্ধ মানুষ বলেই তার মধ্যে. স্নেহ, দয়া মায়া, ভালোবাসা এবং উপচিকিৎসার প্রবৃত্তি আছে। লোকে বিপদে পতিত হলে কিংবা দুঃখগ্রস্থ হলে ধন্ধ তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করে। আবার অনেক দুঃসাধ্য কাজ সে অনায়াসে সম্পন্ন করে। একবার জঙ্গলে কয়েকজন যুবক-যুবতী মিলে বাঁশকোড়ল সংগ্রহ করতে গিয়ে তাদের একজন অন্যদের থেকে দূরে সরে পড়ে। ইত্যবছরে একটি নেকড়ে বাঘ এসে তাকে আক্রমণ করে। ধন্ধ আড়ালে কাছাকাছি ছিল। সে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে গিয়ে

বাঘটির কপালে প্রচন্ড আঘাত করে আক্রান্ত লোকটাকে রক্ষা করে। নেকড়েটা পালিয়ে যায়। পাড়ায় যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসা করার জন্য বৈদ্য বা চিকিৎসককে যতদূর কিংবা যত গভীর রাত হোক না কেন ধন্ধ ডেকে নিয়ে আসে। আর বৈদ্যের কথিত ঔষুধ বনজ লতা, গুল্ম, গাছের শিকর, যত রাতেই হোক না কেন ধন্ধ ঠিক ঠিক সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। কোন মূল্য বা কোন প্রশংসার ধার ধারে না সে। নিঃস্বার্থভাবে লোকের উপকার করাই তার প্রবৃত্তি। ধন্ধদের পাড়ার কাছাকাছি আরো তিন/চারটা পাড়া আছে। এ পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যোগাযোগের জন্য যে রাস্তা, সে রাস্তাটি কিছু পাহাড়ের গা বেয়ে, কিছু ছড়ার পথে ছড়িয়ে আছে। পাড়াগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে "কুসুমগুলো ছড়ায়" কয়েকটি বনমানুষের গর্ত আছে। পাথরের দেয়াল কেটে কেউ সুড়ঙ্গ তৈরি করেছে বলে মনে হয়। সুড়ঙ্গের দেয়ালে লোহার বাটালী দিয়ে খনন করা হয়েছে বলে অনুমিত হলেও আসলে সেগুলি বনমানুষের নখের আঁচড়। মাঝে মাঝে একটি বনমানুষ দেখা যায় বলে বহুদিন ধরে লোকদের মুখে মুখে শোনা যায়। তবে বনমানুষটি এযাবত কারও ক্ষতি করেছে এমন কোন খবর পাওয়া যায়নি। লোকজন তার কাছাকাছি এলেই সে দ্রুত পালিয়ে যায়। তথাপিও লোকেরা সতর্ক হয়ে এই পথে চলা ফেরা করে থাকে। ধন্ধের বড় বোনের ঘর তার দাদার ঘরের চারখানা ঘরের পরে। তার ভগ্নিপতি বেশ কর্মঠ। অবস্থা সচ্ছল। তার একটি মেয়ে, ছেলে দুটো। মেয়েটি সবার বড়। মেয়ে "এঙাবি" তার মা এবং মামাদের ন্যায় ফর্সা এবং সুন্দরীও। সে পরিপূর্ণ যুবতী। ধন্ধ পারতপক্ষে মেয়েদের দিকে তাকায় না। পুরুষ হোক নারী হোক কারও স্পর্শ তার গায়ে লাগলে সে ফুঁ-দেয়, বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়ায়, আর হাত দিয়ে মোছে কিন্তু তার ভাগিনী এঙাবিকে সে স্পর্শ করে থাকে। এঙাবি তার গায়ে লাগলেও সে বিরক্ত হয়না। বরং খুশি হয়। তার দিদিকে মাঝে মাঝে বলে, বেভেই (দিদি) এঙাবিকে জামাই দিওনা। তার ভগ্নিপতি জিজ্ঞেস করে কেন? সারা জনম কি বাবা-মায়ের ঘরে থাকবে এঙাবি? তখন ধন্ধ জবাব দেয়, এমনি বলছি, আর কী। এঙাবি লাজুক লাজুকদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার মামা ধন্ধের দিকে। উভয়ের চোখাচোখি হলে

CamScanner

এক রহস্যময় হাঁসি ফুটে ওঠে উভয়ের মুখে। মামা-ভাগিনীর এই রহস্যময় হাঁসির অন্তরালে কি লুকানো থাকে তা কারো জানা হয়না।

পাড়ার লোকেরা প্রায় সকলেই সচ্ছল। জুমের ধান তোলা হলে আশ্বিন-কার্তিক মাসে প্রতিটি ঘরে নবান্ন উৎসব হয়। নবান্ন উৎসবের অপরিহার্য কাজ হচ্ছে মিত্তিনির পূজা অর্থাৎ মেদিনীর পুজা, মা বসুমতীর পূজা। যে মেদিনী উদারভাবে ফসল দেয় সেই মেদিনীকে সবার আগে পূজা করে নবান্ন এবং আমিষ খাদ্য দিয়ে উঠানে মাদুর বিছিয়ে তার উপর কলাপাতাতে নবান্ন এবং ছোট চিংড়ি, কাঁকড়া ও মুরগীর মাংস দিয়ে পূজা দেয়া হয়। সেই নবান্নে অবশ্যই মদও থাকে। এতদসঙ্গে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যও একই রকমভাবে পূজা উৎসর্গ করা হয়। তবে যার উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হয় সে যদি নিরামিষাশী হয় তার উদ্দেশ্যে নিরামিষ খাদ্যই দেয়া হয়। এই নবান্ন উৎসবে বুড়ো-বুড়িদের ভালভাবে যত্ন সহকারে খাওয়ানো হয়ে থাকে।

প্রতি বৎসর নবান্নের সময় ধন্ধকে সব কাজেই পাওয়া যায়। মিত্তিনি পূজায় যে মাছ কাঁকড়া প্রয়োজন হয়, এইসব ধন্ধই যোগাড় করে নিয়ে আসে।

একদিন এঙাবির বিয়ে হয়ে গেল ঝামদিমোনের নরমনি মহাজনের বড় ছেলে আদরচানের সঙ্গে। বিয়েতে পাড়ার লোকরা সবাই আনন্দিত হয়ে তৃপ্তির সাথে খাওয়া-দাওয়া করল। কিন্তু মামা ধন্ধ ভাগিনীর বিয়ের দিনের আগের দিনের সন্ধ্যায় ঘর থেকে বেড়িয়ে গেছে কোথাও। বিয়েতে সে যোগ দিল না। সে কোথায় এবং কেন চলে গেছে তা কেউ জানল না। ঘরের লোকেরা তার সন্ধান করাও বোধহয় প্রয়োজন মনে করেনি। বিয়ের তিনদিন পর আদরচান যথারীতি শ্বশুরালয় থেকে নববধূ এঙাবিকে নিয়ে যখন বাড়ি ফিরছে সেই সময় পথে বনমানুষটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। আগে বনমানুষটি কোন সময় মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি হলে এক পলকও দাঁড়িয়ে না থেকে দ্রুত পালিয়ে যেত। এবার সে আদরচান-এঙাবিকে দেখেই তাদের দিকে এগিয়ে এল। উভয়ে সচকিত হয়ে পেছনে ফিরে পাড়ার দিকে পালাতে চেষ্টা করে। আদরচান এঙাবির জন্য অপেক্ষা না করেই নিজে দৌড়াতে থাকে। কিন্তু এঙাবি তার সামনে

দৌড়াতে পারল না। বনমানুষটি তাকে ধরে ফেলল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার গর্তে নিয়ে গেল। আদরচান নিজ পাড়ায় ফিরে না গিয়ে শ্বশুর বাড়িতে এই দুঃসংবাদ নিয়ে এল। এঙাবির বাবা মা, আত্মীয়-স্বজন, সবাই শোকে আর্তনাদ করে উঠল। এই দুঃসংবাদ ঝামদিমোনে আদরচানের বাবা মার কানেও গেল। পাশাপাশি গ্রাম গুলোতেও এখবর জানাজানি হয়ে গেল। কোথাও গোপন রইল না। এই সময় একদিন সন্ধ্যায় ধন্ধ কোথা থেকে ফিরে এল। তার চোখ-মুখ গম্ভীর। এঙবির সংবাদ তাকে দেয়া হলে সে বলল, এঙাবিকে বনমানুষে না নেবে তো কে নেবে?ঠিকই হয়েছে। তার চেহারায় বোঝা যাচ্ছে, সে তৃপ্তিবোধ করছে। তার দিদি, দাদা, ভগ্নীপতি এঙাবিকে উদ্ধার করার জন্য তাকে অনুরোধ করল। বলল, তুমি বাঘের হাত থেকেও মানুষকে উদ্ধার করতে পার, আর বনমানুষের হাত থেকে তোমার ভাগিনী এঙাবিকে উদ্ধার করতে পার না? ধন্ধ কিছুই বলে না। চুপ থাকে। তার চোখে-মুখে পরিতৃপ্তির আভাস যে ফুটে উঠেছে, তা সকলে বুঝতে পারল।

এঙাবির সন্ধানে যারা গিয়েছিল তারা ফিরে এল এঙাবির পিনন আর চন্দ্রহার সহ কয়েকটি অলংকার নিয়ে। আদরচান নিজ হাতে নিয়ে এসেছে অলংকারগুলো। তারা বলল, এগুলো বনমানুষের গর্তের মুখেই পেয়েছে। সম্ভবত এঙাবি বনমানুষের হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য ধস্ত াধস্তি করেছে এবং তখনই এসব তার দেহ হতে খুলে পড়েছে। সেই পিনন আর অলংকার দেখে এঙাবির বাবা-মার সেকি বিলাপ! ধন্ধের দুচোখও ছল ছল করে উঠল। এক সময় দুটো অশ্রুধারা ঝরে পড়ল মাটিতে। সে অনেক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে রইল কাঁদতেও পারল না। কথাও বলতে পারল না। এঙাবির বাবা-মা বিলাপ করতে করতে বার বার ধন্ধকে অনুনয় করছে.. ধন্ধ, তোমার ভাগিনীকে কি বনমানুষের হাতে মরতে দিতে চাও? তোমার আদরের ভাগিনীর জন্য তুমি কিছু করবেনা? ধন্ধ হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল.. ঠিক আছে, আমি যাব, এঙাবিকে নিয়ে আসব। আমাকে শূকরের মাংস আর প্রচুর মদ দাও। ওরা প্রশ্ন করল কী করবে? ধন্ধ কেবল বলল, তোমরা দাওনা, আমি খাব। বিয়েতে খাওয়া-দাওয়ার পর মাংস ও মদ যা অবশিষ্ট আছে তা থেকে ধন্ধকে মাংস আর মদ দেয়া হল। ধন্ধ পাত্রে ভরে নিল সে সব। সাঁঝের বেলা ধন্ধ একা গিয়ে

বনমানুষের গর্তের সামান ভিতরের দিকে একটি পাত্রে মাংস আর একটি পাত্রে প্রচুর মদ রেখে আসল।

পরদিন ঢেঁকির একটি অজা (ঢেঁকিতে ধান ভাঙার মুগুর) হাতে নিয়ে ধন্ধ সেখানে গিয়ে পৌছাল। সেখানে পৌঁছে সে প্রথমেই দেখতে পেল তার রেখে দেয়া মাংস আর মদের পাত্রগুলো খালি। বনমানুষটি এসব কি নিঃশেষ করেছে? ধন্ধ খুশি হল। অজাটি হাতে নিয়ে সাহস করে গর্তে ঢুকে গেল। সে দেখতে পেল বনমানুষটি এঙাবিকে ধরে আছে। এঙাবি তখন ক্লান্ত, অবসন্ন। বনমানুষটি ধন্ধের উপস্থিতি টের পেয়ে হুড়মুড় করে দাঁড়িয়ে ধন্ধকে ধরতে চাইল কিন্তু ধন্ধ তড়িৎ গতিতে অজাটি দিয়ে বনমানুষের মাথায় বিরাশি সিক্কার আঘাত মেরে ফেলেছে। এতে ছিটকে পড়ে গেল দানবটি। এঙাবি কোন রকমে গা তুলে ক্ষীণ স্বরে মামু-ও মামু বলে ধন্ধকে জড়িয়ে ধরল। মাতাল অবস্থায় আঘাত পেয়ে বনমানুষটি আর উঠতে পারল না। ধন্ধ এঙাবিকে জড়িয়ে ধরল। ধন্ধ এঙাবিকে ঘরে নিয়ে এল। আদরচান সচক্ষে দেখল, তার নবপরিনীতা বধু এঙাবি ধন্ধের বুকে জড়িয়ে আছে। এক সময় আদরচান দুঃখে-ক্ষোভে নাকি ঘৃণায় সেখান থেকে চলে গেল, তা কারোর চোখে পড়ল না।

এঙাবির মনে বনমানুষের আতংক বদ্ধমুল হয়ে গেছে। রাত্রে ঘুমাতে পারে না, চিৎকার করে ওঠে। অগত্যা তার মা-বাবা ধন্ধকে বলল, এঙাবি যাতে ভয় না পায় সেজন্য তার কাছে থাকতে। মামা-ভাগিনী এভাবে এক সঙ্গে থাকতে দেখে সবাই ছিঃ ছিঃ করতে থাকে। এ কথা কারোর কাছে গোপন রইল না। একদিন আদরচানের মা-বাবা খবর পাঠাল তারা আর এঙাবিকে ঘরে ফিরিয়ে নেবে না। তাদের ছেলে আদরচানের জন্য তারা অন্য মেয়ে নিয়ে আসবে। দেখতে দেখতে ধন্ধ আর এঙাবি একাত্ম হয়ে গেল। আত্মীয়-স্বজনরা নিরুপায় হয়ে মনের দুঃখ মনে চেপে রাখল। কিন্তু মামা-ভাগিনীর সে দিকে খেয়াল নেই।

পূর্বের মত সে বছরও নবান্ন উৎসবের আয়োজন করার উদ্যোগ নিল এঙাবির বাবা। মিত্তিনি পূজা দেবে নবান্ন উৎসবে। তাই ছোট মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া যোগার করতে হবে। আর এ কাজ পারে ধন্ধই। সে যাবে কুকি-উদান্যা ছড়ায়। এঙাবি জেদ ধরে-সেও যাবে। উভয়ে গেল। এই

কুকি উদান্যা ছড়াটি পাহাড়ের পৃষ্ঠ দেশে সমতল ভূমিতে প্রবাহিত হয়ে কদ্দূর এসে হঠাৎ একজায়গায় তামঝাং (জলপ্রপাত) হয়ে তিরিশ ফুট নীচে নেমে আবার সমতল ভূমিতে প্রবাহিত হয়েছে। এটির স্রোত মিলিত হয়েছে গাছকাটা ছড়ায়। এই তিরিশ ফুট উঁচু তামঝাং এর উপরে প্রচুর চিংড়ি। এত উঁচুতে নীচ থেকে এই ছোট ছোট চিংড়ি গুলি কিভাবে উঠে গেছে কেউ জানে না। প্রকৃতি এবং প্রাণী জগতের বিস্ময়কর লীলা আর কী।

মামা-ভাগিনী মনের আনন্দে মাছ, চিংড়ি ধরল। উপর থেকে চিংড়ি ধরে ক্রমে তামঝাং এর মাথায় ধন্ধ (বেতের তৈরী ত্রিকোণাকৃতি ফাঁদ) লুইটা বসিয়ে দাঁড়ায় আর এঙাবি অপর দিক থেকে চিংড়ি তাড়িয়ে নিয়ে আসতে থাকে। চিংড়ি আসলে ধন্ধ আনন্দে লাফাতে চায় কিন্তু হঠাৎ তামঝাং থেকে ধন্ধ পড়ে গেল তিরিশ ফুট নীচে পাথরের উপর। এঙাবির বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে তার মামা নিশ্চিত মৃত্যুর সাক্ষাৎ পেয়েছে। ও মামু, ও মামু বলতে বলতে সেও দিল ঝাপ। তারপর সব চুপ চাপ।

তাদের এ পরিণতির খবর কেও পায়নি। তারা ঘরে না ফিরলে, ঘরের লোকরা মনে করল মামা-ভাগিনী নিশ্চয় কোথাও পালিয়ে গেছে। এজন্য তাদের খোঁজ কেউ নিলনা। যথারীতি নবান্ন উৎসব হয়ে গেল। পরে লোকে দেখতে পায় তামঝাং-এর নীচে পাথরের ওপর মানুষের দুটো কঙ্কাল। সবাই অনুমান করে এ দুটো কঙ্কাল ধন্ধ আর এঙাবির।

এই ঘটনার পর থেকে অমাবস্যা-পূর্ণিমায় এ তামঝাং-এ গুম গুম গুঞ্জন শব্দ হয়। এখনো এলাকার লোকেরা গুঞ্জন শুনতে পায়। মামা-ভাগিনীর করুণ মৃত্যুর কথা সবাইকে যেন জানান দিয়ে দেয় সেই গুঞ্জন। সেই থেকে ঐ পাহাড়ের খাড়া পার্শ্বদেশ 'কামাহ্'টির নাম হয়তো ধন্ধের নামানুসারে 'ধন্ধ-কামাহ্'।

-o-

[কামাহ্ - খাড়া ভাবে উঠা পাহাড়ের পার্শ্বদেশ।]

বগাকাইন

(বগা হ্রদ)

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় অবস্থিত বগাকাইন (বগা লেইক) অনেক দিন আগে এক বিশাল পাড়া ছিল। অনুরূপ তাজিংদং, কেওক্রাডং প্রভৃতি উচ্চতর পাহাড়গুলোর চতুর্দিকেও পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশে ছিল অসংখ্য পাড়া। এখনো সে রকম অনেক পাড়া আছে। রাইংখ্যং এর উৎসস্থল, ঠেগা নদীর উৎপত্তিস্থল, রেমাক্রি এবং শংখের উর্ধস্রোতের পাশের পাহাড়গুলো মিলে যে বিস্তীর্ণ বনভূমি ছিল, সেখানে বিভিন্ন উপজাতি সুখে বসবাস করত। তখন সংরক্ষিত বনাঞ্চল বলে কোন বন ছিলনা। মুক্ত বনাঞ্চলে তাদের অবাধ বিচরণ ছিল। গ্রাম বা পাড়াগুলো পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত ছিল। এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যাওয়ার জন্য পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশে পথ ছিল। কাছাকাছি দু'পাহাড়ের পৃষ্ঠে যে পাড়াগুলো ছিল তা থেকে অন্য আরো এক পাড়ায় পৌঁছতে স্বাভাবিকভাবে সময় লাগত অনেক। কারণ, পাহাড় নেমে ছড়াপার হয়ে অন্য পাড়ার পাহাড়টার শীর্ষে উঠেই পাড়াতে পৌঁছতে হয়। এজন্য এপাড়া থেকে ও পাড়ায় কোন জরুরী খবর জানানোর জন্য শিঙা বাজানো হত। শিঙার শব্দ দ্বারা সংকেত দেয়া হয় এবং তা শুনেই অপর পাড়ার লোকেরা বুঝতে পারে সুসংবাদ নাকি নেহায়েত দুঃসংবাদ। শিঙা কিভাবে বাজালে কী বুঝায় তা আগে থেকে ঠিক করা থাকে। এই শিঙা বানানো হয় মহিষের শিং অথবা গয়ালের শিং দিয়ে। শিঙার সাংকেতিক ধ্বনি দ্বারা উপজাতীয়রা খবর আদান-প্রদান করত। ফাগুন মাসে পাড়াগুলো খুবই সুসজ্জিত হয়ে উঠত। পাহাড়ের চূড়ায় ছিল অসংখ্য শিমুল গাছ। সব গাছে লাল শিমুল ফুলের সমারোহ আর নানা জাতের পাখির কলরব পরিবেশকে করত মুখরিত। হরিয়াল, সোনার শালিক, টিয়া, ধনেশ আরও রঙ বেরঙের নানা জাতের পাখি দেখা যেত সর্বত্র।

এই পাড়ার আঙু (আঙু হচ্ছে গ্রামের মোড়ল) হচ্ছে 'রামেত্তং'। তার নামেই পাড়ার নাম "রামেত্তং"। তার একটি মাত্র

মেয়ে "লৈচান"। তার মত পাড়ায় খেঙ্গ্রং কেউ ভালভাবে বাজাতে পারে না। একেত পাড়ার আঙ্গুর মেয়ে তদুপুরি ভাল খেঙ্গ্রং বাজায়। তাছাড়া লৈচান ছিল অতীব সুন্দরী, লাবণ্যময়ী যুবতী। রামেত্তং-এর টংঘরে (মুল ঘরের সামনে ইজরের প্রান্তে অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট যে ঘর) প্রতি সন্ধ্যায় কিংবা রাত্রিতে লৈচানের বান্ধবীরা আসে। এক সঙ্গে খেঙ্গ্রং বাজায়। গ্রামের যুবকেরা আসে মাঝে মাঝে, তারাও বাঁশি বাজায়। অনেক সময় বাঁশি, খেঙ্গ্রং বাজাতে বাজাতে রাত গভীর হয়। যুবকদের দলপতি হচ্ছে "মান্দায়্যা"। সে বাঁশি বাজায়। তার বাঁশির সুর আর লৈচানের খেঙ্গ্রং এর সুর প্রেম সংগীতের অপূর্ব সুর তোলে। এতে অন্যান্য যুবক-যুবতীরা ঈর্ষান্বিত হয়। উল্লেখ্য একফালি বাঁশের তৈরি এক প্রকার বাদ্য যন্ত্রকে বলা হয় 'খেঙ্গ্রং'।

আনন্দ কোলাহলময় এই পাড়ায় একদিন হঠাৎ দেখা দিল এক বিরাট সাপ। সাপটি পাড়া থেকে ছাগল, শূকর, এমনকি গরু ও মহিষের বাচ্চাও ধরে নিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে পাড়ার বাইরে চরে বেড়ানো পশুদের ধরে নিত, ইদানিং সাপটি পাড়ার ভিতর ঢুকে গৃহপালিত পশুও ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সাপটি কোথা থেকে আসে আবার কোথায় লুকিয়ে থাকে তা প্রথমে কেউ জানত না। পরে অনেক অনুসন্ধান করে জানা গেল, পাড়ার অনতিদূরে বিরাট এক কালো পাথরের নীচ থেকে সাপটি বেড়িয়ে এসে ছাগল, শূকর ইত্যাদি পশু ধরে নিয়ে গিয়ে সেই কালো পাথরের নীচের গর্তে প্রবেশ করে থাকে। কেউ তার নাগাল পেতনা।

পাড়ার লোকেরা নানাভাবে চেষ্টা করেও সাপকে ধরতে পারেনা। নানা ধরনের ফাঁদ পাতল এবং শূকরের ছানা গেঁথে একটি বিরাট বড়শী পাতল কিন্তু সাপটি কোনটাতে আটকায়না। রামেত্তং আঙ্গু পাড়ার এলাকার মুরব্বি এবং যুবকদের দলপতি মান্দায়্যার সঙ্গে অনেক পরামর্শ করেও কোন উপায় উদ্ভাবন করতে পারলনা।

জুমের ধান তোলা হলে জুমঘর ছেড়ে অনেকেই পাড়ায় চলে আসে। অনেকের জুম ঘরে ধান তোলা শেষ হলেও রান্যাতে তখনো নানা ফসলাদি অবশিষ্ট থেকে যায়। তখন কার্তিক মাসের প্রারম্ভ।

CamScanner

পাড়ায় সাপের উৎপাত যখন বেড়ে গেছে ঠিক এ সময়ে এক রাত্রে রামেত্তং পাড়ার কাছাকাছি একটি জুমঘর হতে সুমধুর বাঁশির সুর শোনা গেল। অপূর্ব সে বাঁশির সুর। শোনা গেল মধুর সুরে-

রুরু বাঁশি রু-রু-রু
মর পরানর, লাঙনী তুই কুরু
বার্গী নলার বাঁশি রু রু রু
তরে ডাগঙর লাঙনী রু রু রু ....।

বাঁশির সুর শুনে পাড়ার সবাই উদ্বেলিত হয়ে উঠল। কী আশ্চর্য্য সুর! পাড়ার যুবতীদের খেংগরঙও একসঙ্গে বেজে উঠল। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। কেউ না বাজালেও খেংগ্রং এর সুর বেজে উঠল একই সঙ্গে, একই তালে-

বিং বিং বিং- খেংগ্রং বিং বিং বিং
ও লাঙ্যাদা বিং বিং বিং
তরে না দিলে কারে দিম
ফুল গামছা বিছাই দিম
লাঙ্যারে ন দিলে কারে দিম।

খেংগ্রং-এর সেই ঝংকার কি বাঁশিওয়ালার কানে পৌঁছেছে? তা কেউ জানে না। তবে শোনা গেল, বাঁশির সুর বার বার পরিবর্তিত হয়ে আরো সুমধুর হয়ে গভীর রাত পর্যন্ত বেজে চলল। যেন মনে হল খেংগ্রং-এর সুরের প্রত্যুত্তর।

পরদিন মান্দায্যার নেতৃত্বে একদল যুবক সেই জুম ঘরে গিয়ে দেখে এক সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী ফর্সা যুবক শুয়ে আছে জুম ঘরে। তার পরনে ধুতি, গায়ে সিল্কের সাদা সার্ট এবং তার ওপর হলুদ রঙের সিল্কের চাদর। দীর্ঘ চুল। সঙ্গে একটি দীর্ঘ শানিত কীরিচ (কৃপাণ)। পথ চলার ক্লান্তির ছাপ তার মুখে ফুটে উঠলেও চোখের দীপ্তিতে শান্ত সৌম্যভাব, তবে উৎফুল্ল। জিজ্ঞেস করলে কথা বলে, তবে অহেতুক কথা বলে না। সবাই উৎসুক হয়ে জানতে চাইল তার নাম, গোত্র, গ্রাম, দেশ ইত্যাদি। ধীরে ধীরে প্রকাশ করল সে-সবাই

তাকে আলংঝা বলে ডাকে। গ্রাম তার ভুসিটং, দেশ রোয়াঙ্গ। স্বজাতিদের সন্ধান করতে করতে এখানে এসে পৌঁছেছে সে। এই বার্গীনলার বাঁশি (বার্গী নামক দীর্ঘ পা ওয়ালা পাখির পায়ের বাঁশি) বাজিয়ে বাজিয়ে এসেছে। সে স্বজাতিদের কোথাও খুঁজে পায়নি। এখানে এসেই সাড়া পেয়েছে। কেননা গত রাত্রে তার বাঁশির সুরের সঙ্গে সঙ্গে এ গ্রামের সব যুবতীর খেঞ্গ্রংগুলো এক সাথে ঝংকার তুলে সুর তুলেছে। তাকে পাড়ায় আসার জন্য সবাই আগ্রহ ভরে আমন্ত্রণ জানালে সে রাজি হল। আঙু রামেত্তং-এর টংঘরে ছোট-খাট একটি উৎসব আয়োজন করে আলংঝাকে বরণ করা হল। রামেত্তং এর একমাত্র রূপসী কন্যা লৈচান পাড়ার অন্যান্য যুবতীদের নিয়ে বনকুসুম সমাহারে আলংঝাকে অভ্যর্থনা জানাল। রামেত্তং আঙুর টং ঘরে স্থান হল আলংঝার। পাড়া লোকজন দিনের বেলায় আলংঝার কাছ থেকে শোনে নানা কথা, তার দেশ রোয়াঙ্গের কথা। রোয়াং থেকে বার্গীর নামক পাখিগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে এদিক উড়ে আসে আবার ফিরে যায়। বার্গীদের নিকট থেকে নাকি সে সংকেত পেয়েছে তার স্বজাতিরা এখানে আছে, তাই সে এখানে এসেছে। বার্গীর নলা দিয়ে বাঁশি বানিয়ে সে বাঁশিতে সুর তুলে তুলে এতদূর এসেছে। তবে ঠিকমতই সে এখানে তার স্বজাতিদের খুঁজে পেয়েছে। পাড়ার লোকেরা অভিভূত হয় তার কথায়-আর স্মরণ করে আনন্দিত হয়।

রাতের বেলা বাঁশি বাজায় আলংঝা। কী যাদুময় সে বাঁশির সুর। রামেত্তং-এর কন্যা লৈচান অভিভূত হয়ে গেল আলংঝার রূপে-গুণে। এতদিন সে ছিল মান্দায্যার প্রতি অনুরক্তা। কিন্তু এখন মান্দায্যাকে ভুলেই গেল। মান্দায্যা ভাবল, এ আপদকে নিয়ে এসে সে ভুল করেছে। কোত্থেকে আবির্ভূত হয়ে আলংঝা তার সব কিছু ছিনিয়ে নিচ্ছে। পাড়ার যুবক-যুবতী সবাই আলংঝার কথায় ওঠে বসে। রাত হলে আলংঝা যখন বাঁশি বাজায়, পাড়ার যুবতীরা সবাই দল বেঁধে খেঞ্গ্রং নিয়ে তার কাছে আসে। বাঁশি বাজে রু রু রু, রু রু রু আর খেঞ্গ্রং বাজে বিন্ বিন্ বিন্, বিন বিন বিন। সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত একরাতও বাদ নেই। মান্দায্যা ফন্দি আটে, আলংঝাকে কিভাবে সরানো যায়? লৈচানকে নিয়ে কুৎসা রটনা করল আলংঝার। এই

কুৎসা ছড়িয়ে দিল সারা পাড়ায় এবং অন্যান্য পাড়া গুলোতে। ছিঃ ছিঃ রবও উঠল পাড়ায়। আহাঃ আঙুর মেয়ে লৈচান কি বেশ্যা হয়ে গেল।

এ সুযোগে মান্দায্যা পাড়ার মুরব্বিদের তার পক্ষে নিয়ে আঙু রামেত্তংকে আলংঝাকে তাড়িয়ে দিতে বলে। পরে ভয়-ভীতিও দেখাল। কিন্তু আঙু রামেত্তং বুঝতে পারে, একমাত্র মেয়ে লৈচান আলংঝার প্রতি যেভাবে অনুরুক্তা, আলংঝাকে তাড়িয়ে দিলে লৈচান প্রাণে বাঁচবেনা। কী করে তাড়িয়ে দেয় সে আলংঝাকে? আর আলংঝাও কি লৈচানকে ছেড়ে যেতে পারবে?

পাড়ার লোকেরা ভাবে, আলংঝা আর লৈচান সারারাত ধরে যৌবন মদিরায় অবগাহন করে চলেছে। কী কুলক্ষণে ব্যাপার! তারা রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে দেখে, পাহারা দেয়। তারা দেখতে পায় রাত গভীর পর্যন্ত বাঁশি আর খেংগ্রং বাজাতে বাজাতে আলংঝা আর লৈচান ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারা পাশাপাশি শোয় কিন্ত উভয়ের মধ্যে রেখে দেয় বার্গীনলার বাঁশি, খেংগ্রং আর আলংঝার দীর্ঘ শানিত কৃপাণ। পরস্পরের গাত্র যেন স্পর্শ না হয় এজন্য মাঝখানে এই পবিত্র জিনিসগুলো রেখে প্রশান্ত মনে তারা ঘুমিয়ে পড়ে। তারা সতর্ক থাকে, নারী পুরুষের সহজাত কামজ আনন্দে উভয়ের পবিত্র শরীর যেন কলঙ্কিত না হয়, কলুষিত না হয়। প্রত্যেক রাতেই পাহাড়া দিয়ে লোকেরা দেখে এর ব্যতিক্রম কোন সময় হয়না। যে নিকৃষ্ট ধারণা মনে পোষণ করে তারা এতদিন যে ছিঃ ছিঃ রব করেছে, আলংঝা আর লৈচানের দেব দুর্লভ এই পুত পবিত্র আচরণের দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল তারা। মানব-মানবী, নর-নারীর পক্ষে এ কিভাবে সম্ভব? পাড়ার লোকদের মনে এখন আর আলংঝা-লৈচানকে নিয়ে নিকৃষ্ট ভাবনা নেই, বরঞ্চ তাদেরকে দেবংশী বা দেবতার অংশ ভাবতে চেষ্টা করছে বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানীরা। সবার মনে বিশ্বাস জন্মাল লৈচান বেশ্যা নয়।

ইদানিং সাপটির উপদ্রব বেড়ে গেছে। পাড়ার লোকেরা নানা ফন্দি করে সাপকে ধরার চেষ্টা করতে লাগল। নানা ধরনের ফাঁদ পাতল এবং শূকরছানা গেঁথে বিরাট বড়শী পাতল কিন্তু সাপটি কোনটাতে আটকায়না। সাপটি এসবের ধারে কাছেও আসেনা।

মান্দায্যা ভাবল, এবার সুযোগ এসেছে আলংঝাকে বিদায় করার। আঙু রামেত্তংকে সে যুক্তি দেখায় আলংঝা যদি দেবংশী হয় তবে সে সাপটি মেরে ফেলুক বা সাপের উপদ্রব বন্ধ করুক আর না পারলে সে চিরতরে এ পাড়া থেকে দুর হয়ে যাক। আঙু রামেত্তং ভাবেও তা-ই। মেয়েটি আলংঝার যাদুতে যেভাবে সম্মোহিত হয়ে আছে তার পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সে কথা ভাবতেই শিহরিত হয়ে ওঠে রামেত্তং আঙু। একদিন আলংঝাকে বলা হল, তুমি যদি সত্যই আলংঝাই হয়ে থাক- সাপটি হয় হত্যা কর নয়ত চিরতরে এই পাড়ায় সাপের উৎপাত বন্ধ করে দাও। আর তা না হলে তুমি এপাড়া থেকে চিরতরে চলে যাও....।

আলংঝা সাপের উপদ্রবের কথা জানে। সাপ যে গর্ত থেকে বেড়িয়ে আসে, সেখানে গিয়ে ঘুরেও এসেছে ইতোমধ্যে। সবকিছু দেখে সে আঙু রামেত্তংকে বলল, সে সাপের উৎপাত বন্ধ করবে। সেখানে মান্দায্যাও উপস্থিত ছিল। সে আলংঝাকে প্রশ্ন করল, তুমি কি সাপকে হত্যা করবে? আলংঝা তার প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করল মান্দায্যাকে- আচ্ছা বলতো এখানকার মানুষদের প্রিয় খাবার কী যা তারা নিত্য খায়? মান্দায্যা এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, আমিতো দেখছি এখানকার লোকেরা মদই নিত্য খায়, কাজেই মদই হচ্ছে তাদের প্রিয় পানীয়। মাথা আন্দোলিত করে আলংঝা বলল, ঠিক, মদই তাদের প্রিয় জিনিস, প্রিয় বলেই নিত্য মদ খায়। এটি মানুষের ভোগ্য জিনিস। এই ভোগ্য মদই সাপকে দিতে হবে। মান্দায্যা আবার প্রশ্ন করল, তুমি সাপটি মারবেনা? তা না হলে তুমি এই উৎপাত বন্ধ করবে কিভাবে? কেমনে? আলংঝা মৃদু কণ্ঠে বলল, কোন প্রাণীকে হত্যা করা উচিৎ নয়।

আলংঝার অনুরোধে রামেত্তং পাড়ার লোকদের দিয়ে প্রচুর মদ যোগাড় করাল। সাপ যে গর্ত থেকে বেড়িয়ে আসে সে গর্তের সম্মুখে একদিন সকালে সূর্য ওঠার আগে পাত্র ভরে প্রচুর মদ রাখা হল। আলংঝা তার বাগী নলার বাঁশি হাতে নিয়ে বসেছে সামান্য দূরে। পাড়ার লোকজন দূর থেকে দাঁড়িয়ে এসব দেখছে। লৈচানও না

এসে পারেনি। সে দাঁড়িয়ে আছে, আলংঝার কান্ড দেখতে। আলংঝার সুর বেজে উঠল। এখন আর আগের সুর নয়। এখন অন্য সুর-

রু রু বাঁশি রু রু রু
ও নাগ নাগিনী রু রু রু
মুই ডাগঙর রু রু রু
পরান কোজালি গুরি আয় রু রু রু
রু রু বাঁশি রু রু রু ....

এই সুর যেন কত যাদু মাখা! অনেক্ষণ বাজার পর বিশাল মাপের সাপটি ধীরে ধীরে গর্ত থেকে বেড়িয়ে আসল। আশে পাশে লোকজন দেখেও কোন ভ্রুক্ষেপ নেই সাপটির। আলংঝার বার্গীনলার বাঁশির সুর আরও মধুর যাদু মাখা হয়ে বাজে। সাপটি পাত্রের মদ খেতে লাগল, খাচ্ছে তো খাচ্ছে-শুধুই খাচ্ছে। খালি হলে পাত্র পূর্ণ করে দিচ্ছে আঙু রামেত্তং-এর লোকেরা। এক সময় সাপটি নেশায় বুঁদ হয়ে গেল। উন্মত্ত হবার বদলে শান্ত ভাবে ঝিমিয়ে পড়ল। মান্দায্যা তার দলবল নিয়ে সাপকে দা, বল্লাম, তীর, ধনুক নিয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। আলংঝা বাঁধা দিলে সে ক্ষান্ত হল। আলংঝা সবাইকে নিয়ে ঘরে ফিরে আসল। তারপর দিন সকালে গিয়ে দেখা গেল সাপটি সেখানে নেই। আলংঝা বলল, সাপ তার ভোগ পেয়ে তৃপ্ত হয়ে চলে গেছে। আর কোনদিন আসবেনা। সত্যি সত্যিই তাই হল। সাপটি চিরতরে চলে গেছে।

মান্দায্যা আশা করেছিল সাপটি আলংঝাকে গিণে ফেলবে। আলংঝাকে মেরে ফেলা সহজ নয়। মান্দায্যা লোকজনকে বোঝাতে লাগল, আলংঝা আসলেই মানুষ। সে দেবতা হতে পারেনা। তাকে এখান থেকে তাড়াতে হবে। তাকে না তাড়ালে একদিন কারো না কারোর ক্ষতি করবে। তার অনুসারীরা সে কথা সমর্থন করল, বিশেষত যারা লৈচানের প্রেম প্রত্যাশী ছিল তারা।

রামেত্তং ভাবে, আলংঝা-আলংঝাই সে দেবংশী। মানুষের দেহধারী স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা। তার কন্যা কলুষিত হয়নি, বরঞ্চ এক ভাল

CamScanner

লোকের অনুসারী হয়েছে। মান্দায্যার চক্রান্ত বুঝতে পেরেছে আঙ্গু রামেত্তং। কিন্তু মান্দায্যার দল খুব ভারী। মান্দায্যা যা করতে চায় তা বন্ধ করা কি সম্ভব? ভাবে রামেত্তং। হায়! এরকম স্বার্থপর নীচুমনা মানুষের কি অভাব আছে?

এখন আর সাপের উৎপাত নেই। পাড়ার লোকেরা মনের সুখে দিন যাপন করছে। পূজা পার্বণে উৎসব আনন্দে সারা গ্রাম উৎফুল্ল, উদ্বেলিত হয়। চৈত্রমাসের এমনি এক উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে সবাই। আলংঝা তার বার্গী নলার বাঁশি বাজিয়ে শোনাল মন দিয়ে। সবাই শুনল মন দিয়ে, হৃদয় ভরে। আনন্দিত সবাই। অপরাহ্নে সে পাড়ার মাঝখানে এক ঝরনার ধারে গেল, স্নান করবে সে। শরীরের ঘাম, ক্লেদ ধুঁয়ে মুছে ফেলবে আর তাপদগ্ধ দেহ জুড়াবে শীতল নির্মল ঝরণার জলে। তাকে অনুসরণ করে লৈচানও সেখানে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু মান্দায্যা সেই সময় তীর ধনুক নিয়ে বদ উদ্দেশ্যে তার পিছু নেবে তা কেও জানেনা। ঝোপের আড়াল থেকে আলংঝাকে লক্ষ্য করে সে ছুঁড়ে মারল বিষাক্ত তীর। পৃষ্ঠে বিদ্ধ হয়ে সে তীরের ফলা আলংঝার হৃদপিন্ড বিদীর্ণ করে দিল। লৈচান দুর থেকে দেখতে পেল আলংঝা যেখানে ছিল সেখানে ধোঁয়ার কুন্ডলী উড়ল আকাশে। আলংঝা নেই, সে অদৃশ্য হয়ে গেছে, কেবল ধোঁয়ার কুন্ডলী একটি তুষার শুভ্র বক পাখি বা বগায় পরিণত হয়ে আকাশে উড়ছে। চক্রাকারে নীচু হয়ে বকটি সমগ্র পাড়ায় এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, চতুর্প্রান্তে উড়ছে। সবার চোখে পড়ল সাদা বকের এই উড্ডয়ন। ঘর থেকে বের হয়ে এল সব যুবতীরা। লৈচান উড়ন্ত বগাকে অনুসরণ করল দৌঁড়ে দৌঁড়ে। অপরাহ্ন পর্যন্ত বগাটি উড়ল। তারপর সূর্য যখন অস্তাচলে দূরে পশ্চিম পাহাড়ের মাথার উপর তার শেষ রশ্মিজাল বিকীর্ণ করতে থাকে তখন সাদা বগাটির গায়েও সেই রশ্মি ঝিকিমিকি করতে থাকে এবং সেই আলোর ঝলকানিতে সাদা বকটি সবাইকে কাঁদিয়ে দক্ষিণ পূর্বদিকে আকাশে উড়তে উড়তে অগ্রসর হল। তা দেখে লৈচান ও অন্যান্য যুবতীরা রামেত্তং পাড়ার বাইরে এগিয়ে সাদা বককে অনুসরণ করল। কিন্তু উড়ন্ত বকটি ততক্ষণে আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তখনই গ্রামের উত্তর প্রান্ত

থেকে মহা প্রলয় ভয়ঙ্কর শব্দে মাটি ধ্বসে যেতে আরম্ভ করল। সন্ধ্যা থেকে যারা রাত চলল এই ধ্বংসলীলা। সূর্যোদয়ের সময় দেখা গেল, গ্রামের পরিবর্তে থৈ থৈ করছে নির্মল জল। সমগ্র পাড়াটি এক বিশাল জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ পাড়ে রামেত্তং, তার স্ত্রী আর একমাত্র কন্যা লৈচান এবং তার সখী কয়েকজন শোক ও বিস্ময়ে দেখল এই দৃশ্য। অন্যান্যদের কোন হদিস পেলনা তারা। এভাবে সৃষ্টি হল বর্তমান বগা-লেইক। মান্দায়্যাসহ তার দলবল ও অপর লোকজন কি এই জলে ডুবে গেছে? অতল তলে তলিয়ে গেছে?

-০-

কয়েকটি ভূতে পাওয়ার কাহিনী

সব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেতাত্মা বা ভূত সম্পর্কে বহুবিধ গল্প প্রচলিত আছে। এই সমস্ত গল্প শুনলে মনে হয় ভূতের উপস্থিতি একেবারে সত্য। তবে প্রেতাত্মা বা ভূত যে দৃশ্যত অনুপস্থিত তাও একপ্রকার সত্য। কেননা এরা অশরীরি। তবে অশরীরি বা দেহবিহীন বলেও তাদের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। বাতাস অদৃশ্য হলেও যেমন অস্তিত্ব অনুভব করা যায় ভূতও ঠিক সেই রকম।

উপজাতীদের মধ্যে এই ভূত সম্পর্কিত নানা গল্প, নানা বিতর্ক প্রচলিত আছে। তবে এটি ঠিক যে, ভূত সচরাচর দেখা না গেলেও ভূত যে আছে তা সবাই বিশ্বাস করে। অনেক সময় বিভিন্ন আকৃতি, বিভিন্নরূপ ও বিভিন্ন মূর্তি ধারণ করে ভূত মানুষের সামনে আবির্ভুত হয়। আবার অদৃশ্য ভাবেও ভূতেরা আবির্ভুত হয় তাও শোনা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, রাত্রে কিংবা দিনে কোন নির্জনস্থানে কেউ অদৃশ্য কারো দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

অন্যরকম ঘটনাও ঘটে থাকে। যেমন, কোন লোক যে কোন সময় ঘরের মধ্যে অদৃশ্য কারো দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। তখন সেই আক্রান্ত লোকটির (মহিলা/পুরুষ) স্বকীয়তা লোপ পায় অর্থাৎ সেই লোকটির স্বভাব চরিত্রের পরিবর্তন হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বভাব চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে। যেমন, যে শান্তশিষ্ট স্বভাবের তার স্বভাব হঠাৎ উগ্র হয়ে ওঠে। মেয়ে মানুষ হলে পুরুষের স্বভাব এবং পুরুষ হলে মেয়ে মানুষের স্বভাব সম্পন্ন হয়। এই ধরণের লোক যা করে থাকে বা আচরণ করতে থাকে যেসব তার ব্যক্তিগত স্বভাবিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই অবস্থায় সেই ব্যক্তিকে ভূতে পেয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে এই রকম ভূতে পাওয়ার বহু গল্প প্রচলিত আছে। অনেক সময় দেখা যায়, কোন শিশু-কিশোর এমনকি বয়স্ক পুরুষ-মহিলাকে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানে ওখানে সম্ভাব্য

সকল জায়গায় খোঁজ করে তাদের খোঁজ মিলেনা। এ অবস্থায় ধরে নেওয়া হয় সম্ভবতঃ ভূতে তাকে অপহরণ করেছে বা লুকিয়ে রেখেছে। ভূতের যদি কোন প্রাণী যথা-মোরগ, শূকর, ছাগল এমনকি গরু-মহিষ ভোগ পাওয়ার ইচ্ছা হয় সেই সব পাওয়ার জন্য ভূতেরা ঐ সব লোকদের জিম্মি হিসেবে অপহরণ বা লুকিয়ে রাখে বলে ধারণা করা হয়। এটা আন্দাজ করে যদি মানত করা হয় এবং তদ্দ্বারা অপহৃত বা লুক্কায়িত শিশু বা সেই ব্যক্তিকে ফের পাওয়া গেলে, ভূতের উদ্দেশ্যে ঐ প্রাণী বলি দেয়া হয়। অনেক সময় বা প্রায় ক্ষেত্রেই অপহৃত বা লুক্কায়িত শিশু কিশোর-কিশোরী বা পুরুষ-মহিলা ভূতের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ফেরত আসে। এই সব আশ্চর্যজনক ঘটনা লেখক নিজেও প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই সব কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হল -

এক

রবিক্কোর মাকে ভূতে পাওয়া

গরীব মানুষ সাচন্যা। ঘর বড়াদম নামক গ্রামের উত্তর মাথার শেষ প্রান্তে। তার একটি মাত্র ছেলে "রবিক্কো"। রবিক্কোর বয়স চৌদ্দ/পনের বৎসর। সাচন্যা তার ছেলেকে গ্রামের ধনী চাষী অক্যা মহাজনের গরু চরানোর কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। সারা বছর গরু চরানোর বদৌলতে দৈনন্দিন পেটের খোরাকির বাইরে অতিরিক্ত চব্বিশ আড়ি ধান রবিক্কোর বাবা-মাকে দেয়া হবে। সাচন্যা আর তার স্ত্রীর নেট উপার্জন হচ্ছে এই চব্বিশ আড়ি ধান, অন্য কোন উপার্জন নেই। সাচন্যার স্ত্রীকে সবাই রবিক্কোর মা বলে ডাকে অর্থাৎ রবিক্কোর মা বলেই সুপরিচিত। সে শীর্ণকায়া। দেখতে কুৎসিৎ। তবে গৃহ কাজে দক্ষ। বেইন বুননে বেশ পারদর্শী। সাচন্যার তেমন কাজ নেই। তার জায়গা জমি নেই। অন্যদের ঘরে মাঝে মাঝে নানা কাজ করে কিছু অর্থ উপার্জন করে মাত্র। অধিকাংশ সময় সে অন্যদের ঘরে বেড়ায়, মদ খায়, ভাত দিলে খেয়ে নেয়। সে মনে করে অন্যদের ঘরে কোন রকমে খেতে পারলে দিন কাটিয়ে দেবে। তার স্ত্রী রবিক্কোর মজুরি হিসেবে পাওয়া চব্বিশ আড়ি ধান দিয়ে সারা বছর কাটিয়ে দেবে।

আসলে চব্বিশ আড়ি (ছয় মন) ধান দিয়ে কি একজনের বছর যায়? মাঝে মাঝে রবিক্কো ঘরে আসে, ভাত খায়। আর সাচন্যাও কি সারা বছর অন্যদের ঘরে ভাত খেতে পায়? কাজেই ঘরে নিত্য অনটন থাকে। এই অবস্থায় মাঝে মাঝে রবিক্কোর মা চাদর আপাদমস্তক জড়িয়ে শুয়ে থাকে। সাচন্যা যখন ডাকে, তখন সে নানা কথা বলতে থাকে। এতে সাচন্যা বিস্মিত না হয়ে পারেনা।

প্রথম প্রথম সাচন্যা মনে করত ঘরে নুন মরিচের অভাবের কারণে রবিক্কোর মা এই রকম আচরণ করে। কিন্তু একদিন স্ত্রীর কথা শুনে রবিক্কো সত্যি সত্যি অবাক হল। তার স্ত্রী তাকে বলছে, "সাচন্যা তুমি নোয়া পতং অথবা বালাঘাটায় গিয়ে ঘর বাঁধ। এই বড়াদম পানিতে ডুবে যাবে। ...... এই বলে হা হা হা করে হাসতে থাকে। তার চোখ, মুখ লাল হলেও মুখে হাসি।

সাচন্যা লক্ষ্য করল, তার স্ত্রী প্রায়ই অতি অদ্ভুত ধরণের কথা যেমনি বলে তেমনি অস্বাভাবিক আচরণও করে থাকে। কিন্তু শোয়া থেকে উঠতে পারেনা, হাত-পাও সাচ্ছন্দে নাড়াচাড়া করতে পারে না। যেন মনে হয় ভারি জিনিস তার গায়ে চেপে আছে। একদিন হাসতে হাসতে রবিক্কোর মা বলল, আমি উদালছড়ি কুকি উদান্যা মোইনের বিশাল পাগুজ্যা গাছের বাড়িতে মেজবান খেয়ে এখানে এসে বিশ্রাম করছি। আসতে খুব কষ্ট হয়েছে কারণ পাগানা বৈদ্য খুব বিরক্ত করে থাকে। এখানে কয়েকদিন থাকব। যখন পানি হবে, তখন এখানে জাহাজ আসবে, সেই জাহাজে আমি ঘোরাফেরা করব। তখন এই পাগানা বৈদ্যকে কলা দেখিয়ে ছাড়ব। তখন পাগানা বৈদ্য বলে একজন বৈদ্য ভূত-প্রেতের তন্ত্র, মন্ত্র ও আঙ নিয়ে বৈদ্যগিরি করত। ভূতে পাওয়া লোককে সে সুস্থ করতে পারে।

বারবার এই রকম অদ্ভত কথা বললে এবং অদ্ভুত আচরণ করলে একদিন সাচন্যা পাগানা বৈদ্যকে ডেকে নিয়ে আসে, ঝাঁড়ফুঁক করায়। সেই সময় রবিক্কোর মা ভীষণ চিৎকার করতে থাকে এবং বলে পাগানা বৈদ্য যেন ঘর থেকে চলে যায়। পাগানা বৈদ্য তখন মুচকি মুচকি হেসে সাচন্যাকে বলে রবিক্কোর মাকে ভূতে পেয়েছে। সেখানে

অনেক লোকজন এসেছে তামাশা দেখতে। পাগানা বৈদ্য তার বিজগ মতে ঝাড়ফুঁক এবং থলে থেকে গাছের শিকর রবিক্কোর মার শরীরে ছোঁয়াতে থাকে। রবিক্কোর মা চিৎকার করে বলতে থাকে... পাগানা বৈদ্য তুই এসব করিস না। আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। পাগানা বৈদ্য ততোধিক এই শিকর রবিক্কোর মার শরীরে ছুঁইয়ে দেয়। অবশেষে রবিক্কোর মা অনুনয় করে বলল... আমি যাচ্ছি যাচ্ছি। আশ্চর্য হয়ে সবাই দেখল রবিক্কোর মা কিছুক্ষণ পরে শান্ত হয়ে শোয়া থেকে ওঠে বসল এবং এদিক ওদিক তাকিয়ে স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে এত লোক কেন এখানে? পাগানা বৈদ্য তখন গর্ব ভরে সবাইকে বলল, শয়তান ভূত আমার সঙ্গে কি করে পারবে? থকতে না পেরে চলে গেল। দেখলে? তখন সবাই পাগানা বৈদ্যকে বাহ্বা দিল।

রবিক্কোর মাকে মাঝে মাঝে ভূতে পেয়ে থাকে। আর ভূতে পেলে সাচন্যা তাড়াতাড়ি বৈদ্য নিয়ে আসত।

দুই

মাচ্যাবিকে ভূতে পাওয়া

সনাচান মহাজন একজন অবস্থাপন্ন লোক। তার চার ছেলে। এরা হচ্ছে ভাগ্যমনি, সিদ্ধামনি, সন্ধ্যামনি এবং রাঙাচোগা। সকলে বিবাহিত। কিন্তু সেনত্তি ও দিবরচান এক মেয়ে এক ছেলে জন্মের পর ভাগ্যমনি মাত্র তেইশ চব্বিশ বছর বয়সে মারা যায়। নিদ্ধামুনি একটু গোবেচারা বা বেকুব ধরণের। কিন্তু তার স্ত্রী মাচ্যাবি চালাক-চতুর। তাদের সংসারে তিনটা ছেলে ও একটি মেয়ে আছে।

ভাগ্যমনির বিধবা স্ত্রী নাম ভান্দপুরি। বড়াদমের অক্যা মহাজনের মেয়ে সে। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী। মাত্র পনের বছর বয়সের ভাগ্য মনির সাথে তার বিয়ে হয়। দু-সন্তান জন্মের পর মাত্র কুড়ি বছর বয়সে সে বিধবা হয়। সনাচান মহাজনের পরিবার যেমনি বড়, তেমনি সচ্ছল। তাই তার বিধবা পুত্রবধূ ভান্দাপুরি পুনরায় বিয়ে করেনি এবং পরিবার ছেড়ে যায়নি। ছেড়ে যাবার ইচ্ছাও তার নেই। পরিবারের সবাই চাষের কাজ করে, সিদ্ধামনি মহিষ চরায়। তাদের চল্লিশটা

মহিষ আছে। ছাগল, শূকর আর হাঁস-মুরগীও আছে প্রচুর। তাদের পরিবারে গরু পালন করা হয়না। তাদের পরিবারে নাকি তিন শিংওয়ালা জন্তু এক সঙ্গে থাকলে বিপদ হয়-এরকম বদ্ধ মুল ধারণা রয়েছে। যে বছর মহিষ, ছাগল এর সঙ্গে একটি গরু পালন করা হল, সে বছর সনাচান মহাজনের বড় ছেলে ভাগ্যমনি মৃত্যু বরণ করে।

সিন্ধামনি সারাদিন মহিষ চরায়। সে চাষের কাজ করেনা। সারাদিন রোদে রোদে থাকে সন্ধ্যায় ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মাচ্যাবি সংসারের অধিকাংশ কাজ সামলায়। এই মাচ্যাবিকেই মাঝে মাঝে ভূতে পায়। যখন ভুতে পায় তখন সে একদম পুরুষের আচরণ করে। তখন মৃত ভাগ্যমনির বিধবা স্ত্রী ভান্দপুরিকে কাছে-কাছে, চোখে-চোখে রাখতে চায় সে। তখন ভূতে পাওয়া মাচ্যাবি হাসে এবং বলে ভান্দপুরি, তোমার জন্য এসেছি। তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। মাচ্যাবি আবার বলে... সনাচান মহাজন খুব ভাল লোক। তার বড় মহিষটি সে আমাকে ভোগ দিয়েছে। বড় মহিষ বলতে আসলে ভাগ্যমনিকে উদ্দেশ্য করে বলা এবং এখানে ঘরের কাছে রাস্তার ধারে আমার জন্য একটি বটগাছ লাগিয়ে দিয়েছে। এখানেই আমি আমার সিংহাসন পেতেছি। এখানে থেকেই আমি ভান্দপুরিকে বিয়ে করব। তার এসব আজগুবি কথা শুনে সকলে অনুমান করল যে, ভান্দপুরিকে আসলেই ভূতে পেয়েছে। পরে বৈদ্য ডেকে ভান্দপুরিকে সুস্থ করে তোলা হয়।

তিন

রমেশকে ভূতে লুকানো

ভূতে পাওয়া লোক সচরাচর শোয়া অবস্থায় থাকে। তারা উঠতে ও বসতে পারেনা। কিন্তু ভূতে লুকানো মানুষরা ভূতের সঙ্গে হেঁটেই চলে। এবার একটি ভূতে লুকানোর কাহিনী শোনা যাক।

রাইংখ্যাং নদীর দক্ষিণ পাড়ে চিরাঅং এর ঘর। সে মাঝে মাঝে বৈদ্যগিরি করে। সে জন্য তাকে অনেকে চিরাঅং বৈদ্য বলে

থাকে। তার ঘর থেকে রাইংখ্যং নদী স্পষ্ট দেখা যায়। যেখানে রাইংখ্যং নদী বাঁক নিয়েছে, সেখানে তীরে শক্ত পাথরের চাঁই। বর্ষাকালে নদীর স্রোত সেই পাথরে আঘাত করলে জলোচ্ছ্বাস উঠে। চিরাঅং-এর ঘর থেকে এসব দেখা যায়।

স্ত্রী মারা যাওয়ার পর একমাত্র পুত্র কালাচানকে সঙ্গে এনে চিরাঅং রাঙাবিজার বিধবা মাকে বিয়ে করে। রাঙাবিজার একমাত্র ছেলে রমেশ। বয়স ছয়/সাত বৎসর। রমেশ উরুক্কু ধরনের। বর্ষাকালে রাইংখ্যং নদীর বাঁকে জলোচ্ছ্বাস দেখলে সে ভয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে চায়।

রাঙাবিজার মায়ের নামে কুতুবদিয়া মৌজায় ধান্যজমি আছে। রাইংখ্যং নদী পার হয়ে পশ্চিমে দুমাইল দূরে কুতুবদিয়া বিলে সেই ধান্য জমি। বর্ষাকালে কালাচান দু-তিন জন কামলা নিয়ে ঐ জমি চাষ করে। জমির পাশে একটি টিলায় তাদের খামার ঘর। টিলাটির উত্তর-দক্ষিণে ঐ দুটো টিলায় অন্য লোকের ঘর-বাড়ি। কালাচান মহিষ চরায়, কামলারা জমিতে ধান রোপন করে। রাঙাবিজা মাঝে মাঝে ধান রোপনের কাজ করতে আসে মূল ঘর থেকে। সঙ্গে তার ছেলে রমেশকেও নিয়ে আসে। বিশেষতঃ রমেশ বর্ষাকালে রাইংখ্যং নদীর বাঁকে জলোচ্ছ্বাস দেখে ভয় পাওয়ার কারণে সেই সময় তাকে জমিনের এই খামার ঘরে থাকতে দেয়া হয়। রমেশ আম, কাঁঠাল খুব ভালবাসে। জৈষ্ঠ্য মাস আমের দিন আর শ্রাবণ মাস কাঁঠালের দিন। কাজেই বর্ষাকালে খামার ঘরে খুব আনন্দ আহ্লাদে কাটিয়ে দেয় সে।

একদিন শ্রাবণ মাসের প্রথম দিকে সন্ধ্যার সময় রমেশ কোথাও হারিয়ে গেল। তাদের একজন কামলা দেবেন্দ্র মহিষগুলো আম গাছের নীচে খুঁটিতে বাঁধার সময় রমেশ তার পাশে ছিল। তখন সাঁঝের আঁধার নেমে এসেছে, মানুষজন চেনা যায় বা চেনা যায় না এই অবস্থা। রমেশকে না দেখে দেবেন্দ্র মনে করল রমেশ ভিটার ওপর খামার ঘরে গেছে। ঘরে গিয়ে রমেশের কথা জিজ্ঞেস করতেই রাঙাবিজা, কালাচান এবং অন্যান্য কামলারা ঘরে রমেশকে না দেখে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। সম্ভাব্য সকল জায়গায় অনুসন্ধান করে

তাকে পাওয়া গেলনা। পূর্বেই বলা হয়েছে, তাদের খামার ঘরটি দুইটি টিলার মাঝখানে অবস্থিত একটি বিচ্ছিন্ন টিলার উপর অর্থাৎ এই টিলার দুই দিকে কিচিং (গিরিপথ)। রাত্রে এই কিচিং-এর পথ দিয়ে লোকজন ভয়ে চলাচল করেনা। তারা মহিষগুলোকে এরকম একটি কিচিঙের সামনে রাত্রে বেঁধে রাখে। সেখানে বড় বড় আম, কাঁঠাল গাছ আছে। সন্ধ্যা না হতেই সেখানে আঁধার নেমে আসে। এই রকম একটি ভয়াবহ জায়গা থেকে রমেশ হারিয়ে গেল। তাদের ঘরভিটার উত্তর দক্ষিণ টিলার উপর যে ঘরবাড়ি আছে এই সাঁঝের আধাঁরে সেখানে যেতে পারে বলে অনেকে সন্দেহ করল। রমেশকে ভূতে লুকাতে পারে বলেও অনেকে সন্দেহ করল।

অনেকে পরামর্শ দিল যে, হয়তো মহিষ কিংবা অন্য প্রাণী মানত করলে ভূতরা রমেশকে ছেড়ে দিতে পারে। লোকজনের এ ধরণের কথাবর্তায় তাদেরও সন্দেহ হল যে, হয়ত সেটা হতে পারে। তাই তারা কোন অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করল, রমেশকে বের করে দাও, আমরা তোমাদের চেলা মহিষটি (সব চেয়ে বড় মহিষটি) ভোগ দেব। এই বলে তারা ওই কিচিঙের মুখে গিয়ে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল মশাল জ্বালিয়ে। সেখানে গিয়ে তারা আবার তিনবার উচ্চারণ করল মহিষ বলি দেবার কথা। এর পনের মিনিট পরে তাদের ঘরের ভিটার উত্তরে কিচিং পাড় হয়ে যে ভিটা বা টিলা, সেই টিলার উপর অবস্থিত ঘরের পাশের কাঁঠাল গাছের উপর থেকে ক্ষীণ স্বরে কারো গলা শোনা গেল। সে ক্ষীণ স্বরে ডেকে বলছে, যেন তাকে গাছের উপর থেকে নামানো হয়। সেই শব্দ শুনে সেখানে গিয়ে দেখা গেল গাছের উপরের মাথায় দু'ডালের মাঝখানে রমেশ বসে আছে। টর্চ জ্বালিয়ে তাকে স্পষ্ট দেখা যায়। রাঙাবিজা এবং কালাচানকে খবর দেয়া হল। তারা মই বানিয়ে অতি কষ্টে রমেশকে গাছ থেকে নামাল। রমেশ যত উপরে বসে আছে এরকম উপরে সাঁঝের আধাঁরে উঠা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

ঐ গাছ থেকে নামানোর পর রমেশকে কী কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করা হয়। সে প্রকৃতিস্থ হয়ে ভয়ে ভয়ে যা বলল তা এরকম, দেবেন্দ্র

CamScanner

খুঁটির সঙ্গে মহিষ বাঁধার সময় তার দাদু চিরাঅং (ঠিক তার মত একজন বয়স্ক লোক) এসে তাকে হাতে ধরে তার সঙ্গে কাঁঠাল খাওয়ার জন্য যেতে বলে। তারা সামান্য দূরে যাবার পর একটি ঘরে ওঠে। সেখানে একটি পাটি বিছিয়ে দিয়েই চিরাঅং কোথাও যায় বা ঘরের ভিতরে চলে যায় এবং তার পরিবর্তে একজন সুন্দরী মহিলা তাকে পাকা কাঁঠাল, ভাত, মাংস ও পিঠে পরিবেশন করে। সে খুশি মনে আগে কাঁঠালের কয়েক কোষ খেয়ে ভাতের থালাতে হাত দিতে যাবে এমন সময় হঠাৎ দেখে ঐ সব কিছুই নেই। তার পরিবর্তে সেই কাঁঠাল গাছের উঁচু ডালে একা অসহায় ভাবে বসে আছে।

সম্ভবত সেই সময় তার বাবা রাঙাবিজা আর তার কাকা কালাচান ভূতের নামে মহিষ বলি দেওয়ার মানত করেছিল। তাই ভূত তাকে ছেড়ে দিয়েছে।

-০-

CamScanner